শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

এই লেখকের :—

জীবনের ওপার থেকে

অবিশ্বাস্য

আজও যা ঘটে

অজানার আঙিনায়

নীলসায়রে (যন্ত্রস্থ)

নেপথ্যলিপি (যন্ত্রস্থ)

তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রকাহিনী (যন্ত্রস্থ)

॥ এক ॥

ছুনিয়ার যত রহস্য—সমস্ত যেন উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে এই রাস্তায়।

এই রাস্তা দিয়েই অবাধ্য ঘোড়া কোন অদৃশ্য আকর্ষণে ছুটে চলেছিল সেই সন্ধ্যের পর।

আমিও আগের পরিবেশ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যের পরই আমার যাত্রা সুরু।

ঘোড়াটা ছুটছে।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়ালুম বাইরে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। এই অন্ধকারেই নবীনা রঞ্জন মুমরু গেছল এখান দিয়ে। তখনকার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে আমার।

বাতাসে ভয়ংকরের নিশ্বাস।

আকাশ-মাটি জুড়ে রহস্যের জাল বিছানো।

প্রতিটি নক্ষত্র যেন অন্য মূর্তি ধরেছে। ষড়যন্ত্রকারীর চেহারা ফুটে উঠছে মিটমিটে আলোয়। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারটাকে আরো ঘন করে তুলেছে।

সন্ধ্যের পরই গহিন রাত নামল জায়গাটায়।

সইসের মুখের আদল বদলাল। চোয়ালের হাড় ছু'টো গালের চামড়া ঠেলে উঁচু হয়ে উঠল। ঘোড়ার লাগাম ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছে, না একটা অদৃশ্য হাত ওর হাত ছু'টো ধরে আলগা করে দিচ্ছে—বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

ঘোড়া ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দিক্‌-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। যে পথ ধরেছে, নতুন—অজানা-অচেনা। সইস তো বধির হয়ে গেছে। কোন কথাই কানে ঢুকছে না। চতুর্দিক নিথর-নিঝুম। ঘোড়ার খুরের খট-খট শব্দ শতগুণ বেজে উঠছে।

গাড়িতে মোট তিনজন। নবীনা, রঞ্জন আর মুমরু। মুমরুর কুচকুচে কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে উঠেছে। দু'চোখে ভয় ত্রাস ছেঁকে ধরেছে। ও যেন কেমন হয়ে গেছে। অমন শক্ত জোয়ান মানুষটার দেহে যেন প্রাণ নেই। পাথরের পুতুল একটা।

নবীনা রঞ্জনের পাশে বসে থেকেও বসে নেই বুঝি। ওর দেহটা রয়েছে শুধু, মন কোথায় চলে গেছে কে জানে। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে। কথা বেরুচ্ছে না বাইরে। মনে মনে কিছু না কিছু বলছে নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করলে উত্তর নেই।

এ গাঁয়ে প্রবেশের মুখেই হাসি-খুশি নবীনা গম্ভীর হয়ে গেছল। বড্ড বেশী গম্ভীর। বিয়ের পর থেকে বছর চারেক কেটেছে, এরকম মুখের চেহারা দেখেনি রঞ্জন কোনদিন।

রঞ্জন বিশ্বাস করে না ভাগ্য, বিশ্বাস করে না নিয়তি। বিশ্বাস করে কেবল পুরুষাকারকে—কর্মকে আর নিজেকে। নিজে চেষ্টা করলে সব কিছু করা যায়। নিজের কাজেই নিজে বড় হওয়া যায়, ভাগ্য ফেরানো যায়। কুঁড়ে আর দুর্বল মনের মানুষই নিয়তি-ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

যার এমন মনোভাব সেই রঞ্জনের মনে আজ সংশয়ের দোলা লাগছে। নিয়তি কি টানছে তাদের তিনজনকে সত্যিসত্যিই? অবাধ্য ঘোড়াটা কি সাক্ষাৎ যমদূত নাকি? মৃত্যু-গহ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে নাকি? বোধহয় ভাগ্যে লেখা ছিল তিনজনের একসঙ্গে মৃত্যু। এ অবধারিত মৃত্যু আটকাবে কে?

রঞ্জনের এসব মনে হচ্ছে কেন? এটা কি থমথমে পরিবেশের প্রতিফলন?

পাগলের মত চিৎকার করে বলে উঠল সইসকে।—গাড়ি যদি না থামাও, নেমে গিয়ে উচিত মতো শিক্ষা দেবো বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে নবীনা বলে উঠল, না না। থামাবে না মোটে। আরো জোরে—আরো জোরে।

নবীনার ছু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল রঞ্জন।—একি বলছো?

—আমি ঠিকই বলছি। তুমি শুনতে পাচ্ছো না? ডাকছে যে আমায়! কি আকুলি-বিকুলি!

—কি বলছো আবোল-তাবোল? কই, কেউ তো ডাকছে না কাউকে?

—ওই শোন! আয়, আয়!

—না, না। ও সমস্ত কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। তুমি ভয় পেয়ে গেছো।

মুখে সাহস দিলেও রঞ্জনের মনে খটকা লেগেছে। নবীনা মিথ্যে কথা বলতে জানে না। ঠাট্টা-তামাশা করেও মিথ্যে বলুক কেউ—এটাও পছন্দ নয়। উৎকর্ণ হয়ে শুনল কিছুক্ষণ। শুনতে পাচ্ছে না কারো ডাক। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে, সইসকে গাড়ি থামাও বলতে। আগে কোন কথার জবাব দেয়নি। এটা কিন্তু শুনতে পেল। প্রতিবাদ করল সঙ্গে সঙ্গে।

মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে রঞ্জনের। এসব দুঃস্বপ্ন, না সত্যি? গাড়িটা আস্তার মুখে পথ ভুল করল যখন, তখুনি বলেছে মুমরু সইসকে—আরো অনেক এগিয়ে গিয়ে তবে। সইস তাকাল মুখের দিকে। একটু হাসল। লাগাম টেনে ঘোরাতে যাচ্ছে, হঠাৎ পরিবর্তন। মানুষটা আর মানুষ রইল না। রহস্যলোকের একটা যন্ত্র শুধু।

মুমরু নামতে গিয়ে কি ভেবে নামে নি। গাড়ির সঙ্গে এঁটে আরো বসে রয়েছে। আর বোবা হয়ে বসে রয়েছে একরাশ ভয় বুকে নিয়ে।

রঞ্জন নামতে গেছে, বিদেশবিভুঁয়ে অন্ধকারে আর একটা বিপত্তি

না ঘটে আবার—গাড়ি ছুটল, সে বসে রইল, নবীনাকে নামানো গেলনা—এই ভেবে নামা হলনা। বসেই রইল। কিন্তু কতক্ষণই বা বসে থাকা যায়। ধারেকাছে লোক বসতি নেই যে, চিৎকার করে ডাকবে।

সইসটা শয়তান দলের লোক হয়তো। নিজের খপ্পরে নিয়ে গিয়ে শায়েস্তা করার মতলব। মুমরুর সঙ্গে কি যোগসাজস আছে?

বৌয়ের অসুখ। মুমরু একাই আসতে চেয়েছিল। নবীনা জোরজবরদস্তি এসেছে। মুমরু আপত্তি করেছিল। দিদিমণির কষ্ট হবে দেশে-ঘরে। তাছাড়া বাংলা বিহারের সীমান্ত বরাবর হলেও জায়গার কতক কতক পাণ্ডববর্জিত বললেই চলে। কি দেখবে? ধু-ধু মাঠ আর লাল কাঁকরের রাস্তা। কলকাতার মতো এমন সহর ছেড়ে কি ওখানে মন বসবে?

নবীনা শোনেনি। বলেছে, তোমার বৌয়ের অসুখ, আমি কি না গিয়ে পারি? তুমি যে আমাদের পরম বন্ধু। তেমন বুঝলে ওখান থেকে নিয়ে আসবো। এখানে এনে ভালো ক'রে চিকিৎসা করতে হবে।

এর ওপর কথা চলে না। সত্যই মুমরুর উপকার ভোলার নয়। সেদিনের কথা মনে হলে, ওকে দেবতা বলে পূজো করার পরও যেন অনেক কিছু করার বাকি থাকবে তাদের স্বামী-স্ত্রীর সারা জীবন ধরে। ওর ঋণের শোধ হবে না জন্ম-জন্মান্তরেও।

সেই মানুষকেও রঞ্জন শয়তান ভাবছে। পরিস্থিতির ফেরে পড়ে। ভাবছে, ও-ও একজন শয়তান দলেরই লোক। বৌয়ের অসুখ অজুহাত। কথার জাল বিস্তার করে নবীনার আসার ইচ্ছেটা জাগিয়ে তুলেছে। ভুল পথে সইস চলেছে এটাও তাদের বিশ্বাস দেখানো। ভয় পাওয়ার ভাব দেখিয়ে নিরীহ সাজা।

বাজে, সমস্ত বাজে ধারণা রঞ্জনের।

নেয়ার মতলব থাকলে তো অনেক কিছু সরাতে পারতো মুমরু

বাড়ি থেকে। এত দূরে নিয়ে আসার প্রয়োজনই ছিল না। মুমরুই বাড়িতে থাকতো সর্বক্ষণ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ওর ওপর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে মাসের মধ্যে কতদিন। এখানে তো সঙ্গে আছে মাত্র কটা টাকা। নবীনার হাতে দু'টো চুড়ি, আর গলায় একটা সরু হার।

কেন এমন দুর্মতি আসবে এই মানুষের। মুমরু নির্লোভ। অনেক কিছু দিতে চাওয়া হয়েছিল। স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে রঞ্জনের ছোট ভায়ের প্রাণ রক্ষা করেছে এই লোক।

শিবচতুর্দশীর গাজন চলেছে। সন্ন্যাসীরা কাঁটায় পড়ছে, কাটারির ওপর পড়ছে বাঁশের ভাড়া থেকে ঝাঁপ খেয়ে খেয়ে।

দেখতে এসেছে নবীনা। সঙ্গে রঞ্জন। রঞ্জনকে অনেক ধরাধরি করে এনেছে বাপের বাড়ীর দেশে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। রঘুনাথগঞ্জের গাজন দেখতে নয় অবশ্যি। এখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে বুড়ো শিবের গাজন দেখতে। বনেশ্বর গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আসত। বাবা নেই তবু ওখানে গেলে, পরিষ্কার অনুভব করে, বাবা যেন হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

বিয়ের পর এক বছর যা আসতে পারেনি। শ্বশুর-শাশুড়ী ছাড়েনি। যদিও অন্য বাড়ীতে থাকে ওরা, তবুও নতুন বৌয়ের গুরুজনদের মত না নিয়ে কি বেরুনো উচিত? অন্তত নবীনার মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব।

না আসতে পেরে সে বছর যে কি অসম্ভব অসস্তি হয়েছিল নবীনার তা বলে বোঝানো যায় না। কেবলই বাবার ছল ছল দু'চোখ দেখেছে। গাজনের মেলাতে বাবা একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দু'বছরের মাথায় মত পেল। তাও কি আসা যায় নাকি? রঞ্জনকে নিয়ে টানাপোড়েন। একবার বলে আসবো, একবার না। নিজের কারবার—লোহার যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা। মালিক বৌয়ের আঁচল ধরে গাজন দেখতে গেছে একেবারে বৌয়ের দেশে, শুনলে কারিগরদের তো পোয়াবারো। বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর। দল বেঁধে শুঁড়ীর দোকানে গিয়ে আড্ডা জমাবে সব। কাজকর্ম সমস্ত পণ্ড, খদ্দের নির্দিষ্ট সময়ে জিনিস না পেলে হাত ছাড়া হতে কতক্ষণ।

নবীনা দেওরের শরণ নিয়েছিল দাদাকে বুঝিয়ে বলতে। ছোট ভাই অঞ্জন রাজী করিয়েছে। ম্যানেজার বিশ্বাসী, পুরনো। দায়িত্ব নিয়েছে কথা দিয়ে। ভাবনার কোন কারণ নেই।

অঞ্জনও এসেছে।

সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দেখে, মেলায় নানা রকমের হোগলার চালের দোকানপসরা দেখে ফিরছে তিনজনে হাসিমস্করা করতে করতে। রঞ্জন বলছে, তোমার জাগ্রত ঠাকুর দেখলুম বটে। সব সন্ন্যাসীর অক্ষত দেহ। কাটারী-বঁটির ওপর পড়ল, বেল ডালের অমন বড় বড় কাঁটার ওপর সজোরে আছড়ে পড়ল অত উঁচু থেকে, কারো দেহে এতটুকু আঁচড়ই লাগল না। তাজ্জব ব্যাপার।

হাসতে হাসতে অঞ্জন বলল, বৌদিই হয়তো আমাদের সম্মোহিত করে ভেল্কি দেখাল। বৌদি মনে মনে যা ভেবেছে, আমরাও তাই দেখেছি।

নবীনা গম্ভীর গলায় বলল, এসব আমার ভালো লাগছে না একটুও। দেবতারা রুষ্ট হলে বিপদে পড়বো শেষে। তোমরা একটু মুখ বন্ধ কর দিকিনি।

দেবতারা রুষ্ট হয়েছিল কিনা মানুষ জানবে কেমন করে? জানা যায় নি। তবে বিপদে পড়তে হয়েছিল খুব। এমন বিপদ যে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অঞ্জনকে ফিরে পাওয়ার কোন আশাই ছিল না।

খানিক দূর এগোবার পর, একটা আলো-আঁধারি জায়গায় এসে পড়ল ওরা। ঝোপঝাড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলছে অঞ্জন। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল। পা চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল শুকনো ঘাসের ওপর।

সাপটা ঝোপের ভেতর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। গায়ে পা ঠেকার মোক্ষম প্রতিশোধ নিয়েছে বিষধর অঞ্জনের পায়ের গোছে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে। প্রাণঘাতী বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে।

এর পরের ঘটনা পাঁচ ঘণ্টা ধরে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ডাক্তাররা হার মানল। ঘোষণা করল, অঞ্জন মৃত।

মুমরুর এটা দেশ-গাঁও নয়। এসেছে জাতবেরাদারের বাড়িতে। ও-ও গাজন দেখতে এসেছে। নিজের দেশ থেকে আনা শুকনো বনফুলের দোকান বসিয়েছে।

বাতাসে সাঁতার কেটে কেটে অঞ্জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল সর্বত্র। পৌঁছল মুমরুরও কানে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল অঞ্জনের আপাদমস্তক। কি যেন দেখল কি যেন বুঝল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা। দৃঢ় গলায় বলল, একে বাঁচাবো আমি।

উপস্থিত লোকজনদের ভেতর গুঞ্জন উঠল, পাগলের মুখেই একথা সাজে। ডাক্তার যেখানে অপারক, সেখানে উনি বাঁচাবেন মরা মানুষকে।

সাপে কামড়ানো নিয়ে নানান প্রবাদ আছে। সাপের কামড়ে মানুষ নাকি মরেও মরে না। হাতুড়ে হোক, পাগল হোক, বলছে যখন, দাহের আগে একবার ওদের কথা শুনে দেখতে দোষ কি? প্রধানদের কথায় রাজী হ'ল রঞ্জন।

সে কি দৃশ্য! চোখে দেখা যায় না। একটা তো মরে গেছে, আর একটা মরতে চলেছে বাঁচানোর চেষ্টায়। সবল স্নায়ুর লোক বলে রঞ্জন দাঁড়িয়ে দেখছে একদৃষ্টে। নবীনা দেখতে পারছে না।

দু' চোখ জলে ভাসছে। মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বুড়ো শিবের মন্দিরের দিকে মুখ করে। প্রার্থনা করছে, বাঁচিয়ে তোলো অঞ্জনকে। মুমরুকেও বাঁচিয়ে রাখো।

আপশোসের অন্ত নেই নবীনার। তার জন্যই, তারই জেদে একটা ফুলের মতো ছেলে ঝরে পড়ল অকালে। কি সর্বনেশে জেদই না পেয়ে বসল তাকে।

মাড়ির গায়ে জিভের তলায় কতগুলো টুকরো টুকরো শেকড় রেখে দিয়েছিল মুমরু ক্ষতস্থানে মুখ দি'য় রক্ত টানার আগে। সে শেকড় ফেলছে না দুধের গামলায় কি জলের গামলায়। শেকড় থাকছে, ফেলছে শুধু মিশ কালো রক্ত। জলের গামলায় নয়, দুধের গামলায়। একবার করে ফেলছে আর জলের গামলা থেকে জল নিয়ে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে ফেলছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টার পর একটু ফল ফলেছে। মুমরুর দু'চোখ হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে।

এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা। মরণপণ প্রচেষ্টা চলল। মুমরু জড়ানো গলায় বলল এবার, কেউ যেন না আমায় ছোঁয়, আর না ছোঁয় এই মানুষকে। মাটিতে শুয়ে পড়ল মুমরু। বেহুঁশ। এক ঘণ্টা বাদে জ্ঞান হোল। তখন চোখ চাইল ধীরে ধীরে অঞ্জনও। ঘন হলুদ দু' চোখই। বুজল। আবার খানিক বাদে তাকাল। ঘনটা ফিকে হয়ে এসেছে।

বেঁচে উঠল অঞ্জন।

কিন্তু ক্লান্ত-অবসন্ন মুমরু কথা কইতে পারল না। ঠোঁট উলটে দেখল—প্রত্যেক দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় যেন এক একটা ফোড়া ঠেলে উঠেছে।

যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে নবীনা। যে এত করে দেওরের প্রাণ এনে দিল, তাকে কখনো ছাড়বে না জীবন থাকতে। সেবা-শুশ্রূষা করে, সুস্থ করে তুলতে হবে।

নবীনার তদারকে-যত্নে তিনদিন পর সম্পূর্ণ আগেকার সুস্থ মজবুত মানুষে ফিরে এসেছে মুমরু। ধর্মভাই বলে ডেকেছে মুমরুকে। মুমরুও নবীনাকে ধর্মবোন বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

সেই থেকে মুমরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ। মুমরু দেশে না গিয়ে নবীনাদের সঙ্গে চলে এসেছে কলকাতায়।

বছর দুই ধরে রয়েছে। মাঝে মাঝে ওর বৌ কুসমী এসেও থেকেছে। মুমরুর বড় ছেলেটার বিয়ে-থা না হওয়া অবধি কুসমী একেবারে দেশ ছাড়তে রাজী নয়।

সেই কুসমী অসুস্থ, শয্যাগত।

দেখতে এসেছে রঞ্জনদের একরকম অভিভাবক মুমরু। মুমরুর ওপরই বাড়ির যা কিছু দেখাশুনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে নবীনা। মুমরু কর্তব্যে ত্রুটি করে নি কখনো কোন সময়ের জন্য।

মুমরু শয়তান দলের নয়, মুমরু বিশ্বাসঘাতক নয়। মুমরুই মানুষের মতো মানুষ।

শত হস্তীর বল ধরে ঘোড়াটা ছুটছে এবার। গাড়িটা না উল্টে মুখ থুবড়ে পড়ে। দু'পাশে কাঁচে ঢাকা রেড়ির তেলের লম্প জ্বলছে। ধারে-সামনে আলোর রেখা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

সুমুখে একটা বাড়ির কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে। গাড়িটার গতি থেমে আসছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে।

নবীনা চনমন করে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। অস্থির হয়ে পড়ছে। রঞ্জনকে ধরার সুযোগ না দিয়েই আচমকা লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে। ছুটছে। পেছনে কে আছে না আছে, আসছে না আসছে—কোন লক্ষ্য নেই।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল মুমরু-রঞ্জনও। আশ্চর্য, এবারে

ওরা দু'জনে লাফাতেও পারল। নবীনার পিছু পিছু ছুটছে ওরা। ঘোড়াটা থেমে গেল।

জরাজীর্ণ পুরনো বাড়িটার দরজা দু'হাট করে খোলা। খোলা জানলার পাল্লা হাওয়ায় বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। মড় মড় আওয়াজ হচ্ছে। ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। বেলে পাথরের বাড়ি। একতলা। অনেকটা জায়গা জুড়ে।

প্রথম মহলের আঙিনা পেরুতেই বুকটা কেঁপে উঠল রঞ্জনের। সত্যিই কে যেন ডাকছে। স্পষ্ট শুনছে রঞ্জন। কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক। আয়, আয়, আয়!

গাড়িতে এই ডাকই শুনতে পেয়েছিল নবীনা। তখন পায়নি, এখন পাচ্ছে।

দালান দিয়ে আরো ভেতরের দিকে দৌড়চ্ছে নবীনা। দ্বিতীয় মহলের আঙিনা পেরুল। লোকজন কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাকটা কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে পাখি কি বাদুড় কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ডানা ঝটপটের আওয়াজ হচ্ছে স্রেফ।

আবার দালান আবার আঙিনা। এখানে আলো দেখা যাচ্ছে। আলোটা নড়ছে, দুলছে, কাঁপছে। মনে হচ্ছে আগুন জ্বলছে। মানুষ আছে তাহলে। কিন্তু এরকম বাড়িতে এরকম নির্জন পরিবেশে কে এ? কাকে ডাকছে? সত্যিই কি নবীনাকে? কেন, কেন?

যে কেউ হোক না এ, এ সহজ নয় সাধারণ নয়। এ সাংঘাতিক। মানুষের মনের কানে নিজের ডাক শুনিয়ে টেনে নিয়ে আসে। নিয়ে আসে গাড়িকে ঘোড়াকে সইসকে। এ ডাককে বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই কারো। বুদ্ধি এখানে অসহায়। হাত-পা এখানে জড়। সব পথ ভুল ক'রে নিজের পথে নিয়ে আসবেই এ।

রঞ্জন প্রমাণ পেয়েছে পথে।

একটা ভয়ানক কিছু ঘটার আশংকা ছোবল মারছে রঞ্জনের ভেতরে।

আর বেশী এগোল না নবীনা। দাঁড়িয়ে পড়ল। উদাসীন দৃষ্টি। কোন সুদূরে চলে গেছে কে জানে।

আয়! আয়! আয়!

নবীনা দাঁড়াতে পারল না আর। চলছে, তবে খুব আস্তে আস্তে। পাথরের কনকনে ঠাণ্ডা মেঝে মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

ডাক থামল। নবীনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

আয়! আয়! আয়! আয়!

চলতে শুরু করল নবীনা আবার।

একি! নবীনার চলাফেরার শক্তিসুদ্ধ যে ডাকছে তার হাতের মুঠোয়! রঞ্জনের মাথাটা কিরকম করছে। বুকে সাহস বাঁধতে চেষ্টা করছে। নবীনাকে উদ্ধার করতে হবে। মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাচ্ছে সব। যে ডাকছে, সে দেখতে কেমন—ভাবতে গেলে শিউরে উঠছে। নিশ্চয় ভীষণ।

পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে রঞ্জন নবীনাকে।

একটা প্রকাণ্ড বড় ঘরে প্রবেশ করল নবীনা আচ্ছন্নের মতো। এই ঘরেই আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে— একটা মাটির বড় কুণ্ডের মধ্যে। ঘরের কড়িবরগা ঝুলে পড়ছে। একটা ভূমিকম্প কি একটা প্রচণ্ড ঝড়ে ভেঙ্গে পড়বে। চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাবে। জোরে বাতাস বইলেও যেতে পারে। সেই রকমই অবস্থা।

রঞ্জনের ভয় করছে। এখুনি না ভেঙে পড়ে মাথায়। অপঘাত মৃত্যুই লেখা ছিল শেষে বরাতে। মুমরু নীরব। রঞ্জনের পাশে পাশে চলছে। মরতে হয় এক সঙ্গে মরবে, বাঁচতে হয় একসঙ্গে বাঁচবে। সাপের বিষ থেকে বাঁচানোর প্রক্রিয়া জানে সে। কোন অজ্ঞাত ব্যাপার থেকে কাউকে বাচানোর প্রক্রিয়া তার অজানা।

আগুনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নবীনা চুপচাপ।

এবারে 'আয়-আয়ে'র বদলে 'বোস্-বোস্' শুনছে রঞ্জন।

বোস্, বোস্! চিনতে পারছিস নে? চেয়ে দেখ! এটা ছাখ!

এটাও চিনতে পারছিস নে? তুই তো তেমনিই আছিস। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই গড়ন। কথা ক'! বোস, বোস!

নবীনা বসল।

চমকে উঠল রঞ্জন।

আগুনের ওদিকে যে বসে, সে স্ত্রীলোক। বুকে-পিঠে-মাথায় এক হয়ে বসে আছে। সারা শরীরের মাংস ঝুলে পড়েছে। দু'চোখও ঝুলে পড়েছে। একটা মাংসের ডেলা বসে আছে। কথার সঙ্গে গলা কাঁপছে যেমন থর থর ক'রে তেমনি সমস্ত দেহটাও। কাঁপা হাতে কাঠের হাতায় ঘি তুলছে একটা কাঠের বাটি থেকে। আগুনে ঢালছে আর কি সব বিড় বিড় করে বলছে। নিভু নিভু আগুন জ্বলে উঠছে জোরে।

এটা চিনতে পারলি নে? কি পাগল মেয়ে রে তুই। এই চুরি এই হার এই তোর খেলনা বৌরাণী পুতুল—সব রেখে দিয়েছি সাজিয়ে। জানি, তুই আসবি আমার ডাকে। তোর সমস্ত তোকে বুঝিয়ে দিয়ে আমার ছুটি। নে, নে—হাতে তুলে নে।

নবীনা দেখছে আর ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। কি ভাবছে, কি বুঝতে চেষ্টা করছে, কি চিনতে চেষ্টা করছে। চোখ ঘুরছে প্রত্যেক জিনিস থেকে জিনিসের ওপর।

একটা কঙ্কাল শোয়ানো। সোনার গয়নায় মোড়া খেলনার ছোট্ট খাটে একটা শাড়ি পরানো ঘোমটা ঢাকা ন্যাকড়ার বৌ-পুতুল শুয়ে।

মনে পড়ছে না? বৃদ্ধার করুণ স্বর।

নবীনা ফোঁপাচ্ছে। দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে দু'গাল বেয়ে। বৃদ্ধারও চোখে জল।

কাঁদছিস কেন? আজতো আনন্দের দিন রে! কতদিন বাদে ফিরে পেলুম তোকে। পঁচিশটা বছর ধরে তোর অপেক্ষায় রয়েছি। মনে পড়ছে না রে সেই কুয়োর ধার? এবারে আমাকে মনে পড়বেই। দেখ, দেখ চিন্তা করে দেখ।

চোখে হাত চাপা দিয়ে ছ'সাত বছরের মেয়ের মতো ককিয়ে কেঁদে উঠল নবীনা।

কান্নার প্রতিধ্বনি ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্থাণুর মত বসে আছে রঞ্জন, বসে আছে মুমরু। ওদেরও ছ'চোখ জলে ভরে উঠছে।

রাঙামাটির মাঠ পেরিয়ে বাবলা তলার কুয়ো। বহু পুরনো। পাথুরে পাড় ফেটে ফেটে চৌচির। চতুর্দিকে বড় বড় ফাটল হাঁ করে রয়েছে। কখন যে ধসে পড়ে তার ঠিকঠিকানা নেই। কেউ একটা আসে না এখানে। প্রাণের ভয় তো সবারই আছে। একজন কিন্তু তফাৎ। মুঙ্গলি।

ও একরোখা। কারো কোন কথা কানে নেবে না। কথায় কথায় বলে, নিজের বুদ্ধিতে মরা ভালো, পরের বুদ্ধিতে সিংহাসনে বসাও ভালো নয়।

এই কুয়োর জল ওর খুব পছন্দ। কাঁচের মতো, মুখ দেখা যায়। তাছাড়া আর একটা মস্ত কারণ আছে। এই কুয়োর জল না হলে আদমি সোনারামের তেষ্টা মিটত না। ছাতি ঠাণ্ডা হত না।

এক এক করে ছ'বছর কেটেছে। সোনারাম নেই। রঙ্গিয়ার বারো মাস পূর্ণ হতে বাপ চলে গেল ছুনিয়া ছেড়ে। সেই থেকে অন্য কুয়োর জল ছোঁয় না মুঙ্গলি। এখানের জল নিজে খায়, মেয়েকে খাওয়ায়। সোনারাম বেঁচে থাকতে কত না বলেছে খেতে। মুঙ্গলি শোনেনি। বরং ছুজনে ঝগড়া বাধলে, মুঙ্গলি দেখিয়ে দেখিয়ে ঘড়া থেকে অন্য কুয়োর জল মাজা চকচকে পেতলের গেলাসে ঢেলে গিলত ঢক ঢক করে। জ্বলুনি ধরবে সোনারামের ভেতরে।

ধরত জ্বলুনি। মহুয়ার মদ পউরার নেশায় বুঁদ সোনারামের

নেশা ছুটত। ঢুলু-ঢুলু রক্তচক্ষুর তারা দুটো স্থির হয়ে আটকে পড়ত একটা জায়গায়। মুঙ্গলির চুল পাকিয়ে পাকিয়ে ঘাড়ের কাছে গোঁজা আছে যেখানে।

দুমদুম ক'রে পা ফেলে, মাটির মেঝে কাঁপিয়ে তুলে এগিয়ে আসত। চুলে গোঁজা নীল-সাদা বনফুল দুটো টেনে নিয়ে, ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে যেত খোড়ো চালের ঘর থেকে।

মুঙ্গলি খুশী হত। জ্বালাতে পেরেছে।

কিন্তু মরে যাওয়ার পর নিজে জ্বলছে। হারানোর জ্বালা বড় দারুণ। সোনারামের প্রিয় কুয়োর জল ঘটি ঘটি গিলেও জ্বালা জুড়োচ্ছে না। জুড়োবেও না বুঝি কখনো। তবু গিলবে, যতদিন বাঁচবে ততদিন। কারো কোন কথা শুনবে না। তার ব্যথা কেউ বোঝে না। কেউ বুঝবেও না।

মুঙ্গলির সব ব্যথা জুড়োল সেদিন।

বৈশাখী পূর্ণিমার পরদিন বিকেলে। আগের রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নেয়েছে জয়চণ্ডী গাঁও। সেই সঙ্গে যত সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে। ধামসা-করতাল বাজছে। গুমগুম—ঝনাক-ঝনাক আওয়াজে বাতাস মুখর। নাচছে তালে তালে ছেলেমেয়েরা। সামনের দিকে নুয়ে পড়ছে, পেছনদিকে হেলে পড়ছে। গোল হয়ে ঘুরছে। আবার ছেলের দল এদিকে, মেয়ের দল ওদিকে। যে যার দলে, একে অপরের কোমর ধরে ধরে নাচছে। সব-কটা মেয়ে যেন একটা মেয়ে, সব-কটা ছেলে যেন একটা ছেলে। সুন্দর-সুঠাম অঙ্গের চমৎকার নাচ।

মুঙ্গলি দেখছে। একসময় সে-ও নেচেছে কত। অতীত কি বর্তমান হয়ে আসতে পারে না কখনো? কেবল মনেই বাসা বাঁধে মাঝে মাঝে? বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলল মুঙ্গলি।

কাঁটামনসা গাছটার পাশে বসে বসে গান শুনেছে, নাচ দেখেছে। আর নিজের অতীতকেও দেখেছে রাতভোর। নিজের পুরো অতীত

নয়, আধা-অতীতকে দেখতে পেয়েছে বর্তমানেও, মেয়ের নাচের মধ্যে। সাত বছরের মেয়ে রঙ্গিয়া একলা নাচছে একধারে— বড়দের অনুকরণ করে করে। মুঙ্গলির মনে হোল, সত্যিসত্যিই সে নাচছে। ছোট মুঙ্গলি।

'ম্যাকমোড়ে' উৎসব হোল গোটা রাত্রির। মারংবুরু দেবতার পূজোও হ'ল ঘটা করে। পরের সকালে পাঁঠা বলি, মুরগী বলি। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনদিকে কোনকিছুর বাকি রাখা হল না। দু'দিন ধরে।

বিকেল।

ঠাকুর-ভাসানোর মিছিল চলছে। লতাপাতায় সাজানো গরুর-গাড়িতে দেবতা বসে। শিবমূর্তি যেন। সামনে পেছনে দু'ধারে মিছিলের নারীপুরুষ, নানা রঙের ধুতি-শাড়ি পরা। ছেলেরা মালকোঁচা দিয়ে হাঁটুর ওপর ধুতি পরেছে। মেয়েদের হাঁটু অবধি শাড়ি। বুকের আঁচল পিঠ বেয়ে কোমরে এসে জড়িয়েছে। ছেলেমেয়েদের গলায়-হাতে রূপোর গয়না, হার-বালা, কানে মাকড়ি। কারো কারো গলায় আবার রঙিন পাথর পুঁতির মালা।

সমবেত কণ্ঠে গান গাইছে সকলে।

মারংবুরু ইএঞ্জিবি ইমায়েমে,
মারংবুরু ইএঞদায় ইমাইমে।
মারংবুরু ইঞ্চ জমা ইমাইমে....।

তুমি প্রাণ দাও!
তুমি জল দাও!
তুমি অন্ন দাও!

রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গাইছে মুঙ্গলিও।

গান চলে যাচ্ছে দূরে, আরো দূরে। মিলিয়ে যাচ্ছে সুর-কথা। মিলিয়ে গেল। গ্রামের শেষে পৌঁচেছে দেবতা। পাহাড়ের

এদিকে দুটো দীঘির বড়টার টলটলে জলে বিসর্জন হবে দেবতার। দেবতা চলে যাবে। দু'চোখে জল এলো মুঙ্গলির। জলের ঘড়াটা নামানো ছিল পাশে, কাঁখে তুলে নিল। পা বাড়াল কুয়োর দিকে।

কুয়োর উত্তর-দক্ষিণ গায়ে সাঁটা খাড়া বাঁশ দুটোর ওপর আড়াআড়ি বাঁশটার মধ্যিখানে দড়ি বাঁধা বালতি ঝুলছে। দড়ি ধরে আলগা করে দিল মুঙ্গলি। বালতি নামল জলে। দড়ি ধরে টানছে। জলভর্তি বালতি উঠছে। দেহের ভারটা সম্পূর্ণ পাড়ের ওপর। পাড়টা কাঁপছে, খেয়াল নেই। মনে মনে ভাঁজছে মিছিলের গান—মারংবুরু ইঞ্দায় ইমাইমে····।

হুড়মুড় করে পাড় ভেঙ্গে পড়ল। মুঙ্গলির মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে এলো শুধু। —রঙ্গিয়া।

বিসর্জন দেখে ফিরল রঙ্গিয়া যখন, তখন সব শেষ। দেবতার বিসর্জনের সঙ্গে মায়েরও বিসর্জন হয়ে গেল।

কাঁদছে আর মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে রঙ্গিয়া।

একসঙ্গে অনেক থাকের বড় ঘুঙুরের ঝমাঝম ঝমাঝম আওয়াজ ভেসে আসছে। বাঁড়ুয্যে বাড়ির টমটম গাড়ি আসছে। ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের আওয়াজ। গাড়িটা এসে থামল রঙ্গিয়ার কাছ বরাবর। দরজা খুললো সহিস। নামল সুরলতা। অনঙ্গ বাঁড়ুয্যের বিধবা পুত্রবধূ। রূপে সাক্ষাত জগদ্ধাত্রী, মেজাজে কমলা, দয়া-মায়ায় অন্নপূর্ণা। আর বুদ্ধিতে সরস্বতী।

সুরলতাকে ছেলে-বুড়ো শ্রদ্ধা করে সকলে। দেখলে মাথা নোয়ায়, দূরে সরে পথ ছেড়ে দেয়। নিঃসন্তান সুরলতা সকলের মা।

রঙ্গিয়াকে মাটি থেকে তুলে নিল সুরলতা। হাত দিয়ে সারা শরীরে ধুলো ঝেড়ে দিল। চোখের জলে বুক ভিজেছে গাল ভিজেছে। লাল ধুলো হয়ে উঠেছে লাল রক্ত। গায়ে জড়ানো সাদা উড়ুনির খুঁট দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে দিল সে দাগ।

কাছে দাঁড়িয়েছিল মুখিয়া—পঞ্চায়েতের প্রধান। ইশারায়

কাছে ডাকল। বলল, তিনকুলে কেউ নেই মেয়েটার। মা-টা যা ছিল, সে-ও তো গেল। শুনে, না এসে পারলুম না। এর কি ব্যবস্থা করছো? আমি যদি রাখি কাছে—ও যদি আমার মেয়ে হয়—আপত্তি আছে তোমাদের?

এ তো ওর পরম সৌভাগ্য।

বুকে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে তুলল রঙ্গিয়াকে সুরলতা।

নিজের মন রঙ্গিয়ার মনে বসিয়ে নিজের প্রকৃতি রঙ্গিয়ার প্রকৃতিতে খোদাই করে এঁকে দিতে চেয়েছে সুরলতা। রঙ্গিয়া তার বর্তমান, রঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ।

দিনে দিনে কিশোরী রঙ্গিয়া সুরলতার ছাঁচে তৈরী হয়ে উঠতে লাগল। তৈরী হয়ে উঠল সম্পূর্ণ যৌবনে। চলনে-বলনে সবেতে দ্বিতীয় সুরলতা। রঙটা যা কেবল পায়নি। পূর্ণিমা-অমাবস্যার তফাৎ। সুরলতা যেমন ফর্সা রঙ্গিয়া তেমনি কালো। একেবারে কষ্টিপাথর। তা হোক, গড়নে-লাবণ্যে সব সুন্দরীকেই হার মানায়। সুন্দরীদের ঈর্ষার পাত্রী। পাথরে খোদাই দেহ।

বিধি নিখুঁত নিটোল করে গড়ে তুলেছে রঙ্গিয়াকে নিরালায় বসে বসে। এই রূপসী রঙ্গিয়ার ওপর শ্যেনদৃষ্টি একজনের। শুধু এখন নয়, রঙ্গিয়ার এ বাড়িতে আসা থেকেই। সে সম্পত্তির নায়েব ফণী-ভূষণ। ফণীভূষণ মাণিক হ'লে তো কথাই ছিল না, এ কেবল ফণী। কুটবুদ্ধির বিষে ভরা ফণী।

প্রজাদের ওপর দুর্ব্যবহার-অত্যাচারের অনেক কাহিনী পৌঁছয় সুরলতার কানে। সাবধান করে দিয়েছে সুরলতা। মানে নি। মানে না। কুটিল হাসি ফুটে ওঠে চোখে-মুখে। বলে, কি বলছেন বৌদি? কর্তার আমল থেকে বিষয়-আশয় দেখাশুনা করে করে, কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয়—আমার চেয়ে বোঝে কে? কত মাথা বুদ্ধি নিতে আসে এই মাথার কাছে।

শ্বশুরের বন্ধুর ছেলে ফণিভূষণ। শ্বশুরই এনেছে এ বাড়িতে।

কাজে লাগিয়েছে। কাজে লাগার আগে বহুবার এসেছে। সুরলতার সঙ্গে গল্প করেছে বসে বসে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরেছে। যাওয়ার সময় বলেছে, বৌদির মতো মানুষ ভূ-ভারতে নেই। বৌদি এ বাড়িতে আসি স্রেফ তোমারই জন্যে। এত আদরযত্ন পাই নি জীবনে। জানো তো বাড়িতে সৎমা।

জানে বলেই সুরলতা স্নেহের চোখে দেখেছে এতদিন ফণিভূষণকে। ফণিভূষণের জীবনটা সত্যিই দুর্বিষহ। বাড়িতে টিকতে পারে না বলে বেচারা সংসারী হ'তে পারল না। দেখেও মায়া হয়।

যে মায়া ছিল সুরলতার, সে মায়া উবে যাচ্ছে নানা কারণে। শ্বশুর চলে যাওয়ার পর থেকে যেতে শুরু করেছে। যে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে নিজে, অপরের দুঃখ-কষ্টে তার মমতা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ফণিভূষণের হৃদয়ের অভিধানে মমতা বলে কোন কথার উল্লেখ নেই বুঝি।

ছ'টা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হ'ল শ্বশুরের। ছবির সামনে ছবি হয়ে বসে চোখের জল ফেলেছে ফণিভূষণ। এইতেই সব কর্তব্য শেষ। শ্বশুরের আদর্শ ধূলিসাৎ, তার মনের ইচ্ছের অপমৃত্যু। এই একটা মাত্র লোকের জন্য। শ্বশুর চেয়েছিল প্রজা সুখে থাকুক। সুরলতাও তাই চায়। বৃথা জুলুম না করে ওদের অভাব-অনটন বুঝতে হবে। দেখতে হবে সহানুভূতির চোখ দিয়ে।

সে আশায় আগুন জ্বলল। নির্দয় ফণিভূষণের আইনের খাতায় খাজনার দায়ে কারো ঘটিবাটিটা পর্য্যন্ত রেহাই পায় না। শ্বশুরের সময় লোকটা মুখোশ পরেছিল। সভভার। দয়ার অবতার সেজে বেড়াত। সে মুখোশ খসেছে, নকল অবতারের রঙ চটেছে।

ফণিভূষণের অত্যাচারের মাশুল গুণে দিয়ে আসে সুরলতা প্রজাদের ঘরে গোপনে গিয়ে। তাদের অভাব পূরণ করে দিয়ে আসে অর্থ দিয়ে অন্ন দিয়ে। ওদের মনে শান্তি থাকলেই সুরলতার

মনে শান্তি। ওদের পেট ভর্তি থাকলেই সুরলতার পেট ভর্তি। ওদের চোখের ঘুমই সুরলতার চোখে ঘুম।

পেটের ভাত কেড়ে নেয়া, রাতের ঘুম কেড়ে নেয়া, মনের শান্তি কেড়ে নেয়া মানুষকে কি কেউ কখনো বরদাস্ত করতে পারে —যার মাথায় এতটুকুও বিবেকের আনাগোনা আছে? পারে না।

চাকরি থেকে অনেকবার খারিজ করতে মনস্থ করেছে। শ্বশুরের মুখ ভেসে উঠেছে, কথা মনে পড়েছে।—বৌমা, আমি মরলে, তুমি একে দেখো। বাপটা তো থেকেও নেই। আমার আর একটা ছেলে। নন্দদুলালে ওতে হরিহর আত্মা ছিল। আজ নন্দদুলাল নেই, ওকে দেখলে মনে হয়, নন্দদুলাল নেই নয়। বেঁচে আছে যেন।

চোখে আঁচল ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বিয়ের এক বছর পরেই স্বামী হারিয়েছে সুরলতা। স্বামী কি বোঝার আগেই দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তার। বারো বছর বয়সে বৌ হয়ে এসেছে এ বাড়িতে। তেরোয় বিধবা।

গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলতে গিয়ে বল লাগল সজোরে বুকে। তারপর থেকেই রক্তবমি। অসুখ সারল না। দিন দিন ক্ষীন হয়ে আসতে লাগল। সুরলতাকে দেখলেই বলেছে, সুর। তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

শ্বশুরের ছেলে, স্বামীর বন্ধু। ফণিভূষণকে খারিজ করার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে সুরলতা। পাল্টালেও ওর সমস্ত কাজে দৃষ্টি রাখে।

ইদানীং ওর চাউনিটা কেমন কেমন। রঙ্গিয়াকে দেখলে, সেটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে আরো। রঙ্গিয়া কাছে এলে ফণিভূষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে তাড়াতাড়ি।

একদিন দু'দিন পরপর সাতদিন লক্ষ্য করল। আর দেরী করা উচিত নয়। মনোভাবটা জেনে নেয়া উচিত।

ডাকাল। রঙ্গিয়াকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে একান্তে আলোচনায় বসল।

দেওয়ালে দেওয়ালে লাল ভেলভেটের ফ্রেমের বাঁধানো আয়না। বাতিদানিতে বড় বড় সাদা মোমবাতি দুটো করে জ্বলছে। মেঝের ফরাশের ওপর বসে দুজনে। দক্ষিণদিকে জানলার ধারে সুরলতা উত্তরদিকে দরজার পাশে ফণিভূষণ। দরজায় রঙ-বেরঙের কাঁচকাঠির পরদা। বাতাসে দুলছে। জলতরঙ্গ আওয়াজ তুলছে।

বিষয়ী ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় এখানে ডাকে সুরলতা ফণিভূষণকে। ফণিভূষণ সেটাই ভেবেছে। হাসি হাসি মুখ।

সুরলতার ঠোঁটে শান্তসুন্দর মিষ্টি হাসি। সন্ধ্যের প্রদীপ জ্বেলে ঠাকুর ঘর থেকে এসেছে সবে। গুগগুল ধুনোর ধোঁয়া ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে এ ঘরে। একটা স্বর্গীয় আমেজে দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে। গুগগুল ধুনোর গন্ধে যেন দেবী-দেহের গন্ধ পাচ্ছে। ভরে উঠছে ঘরটা। পরম শান্তি।

সবসময় একভাব একক্ষণ আসে না। এলে অপব্যবহার করা উচিত নয়। শ্বশুরই কথাটা বলেছিল একসময়। অন্য কোন কথা কইতে ভালো লাগছে না। একা থাকতে ইচ্ছে করছে। আর এই ভাবটাকে বজায় রাখতে ইচ্ছে করছে।

মৃদু গলায় বলল, আজ তুমি এসো তাহলে। উঠে চলে গেল, ফণিভূষণকে কোন কথার সুযোগ না দিয়ে।

পর পর তিনদিন একই ঘটনা ঘটল। সুরলতার ডেকে পাঠানো, ফণিভূষণের আসা, চুপচাপ বসে থাকা আর নীরবে মৌন-মুখে ফিরে যাওয়া। এর আগে এরকম হয়নি কখনো। সুরলতা ডাকে, কাজের কথা কয়। এ অদ্ভুত আচরণ। ফণিভূষণের কেবলই মনে হচ্ছে, সুরলতা কি বলতে চায়। এমন কি কথা, যে কথা বলতে এত দ্বিধাসংকোচ! ফণিভূষণ নিজেকে জানে। সুরলতার ওপর কোথায় তার দুর্বলতা আছে তাও। সুরলতারও কি ওই একই রকমের দুর্বলতা তার ওপর? এরই কি প্রমাণ এই অদ্ভুত ইঙ্গিত?

সুরলতাকে কাছে পাওয়ার জন্য কত না চেষ্টা করেছে ফণিভূষণ।

প্রজারা সুরলতার প্রাণ তাই ইচ্ছে করেই ওদের দুর্গতিতে ফেলেছে। শুনে, সহ্য করতে পারবে না সুরলতা। তাকে ডাকবে তাকে সাবধান করবে। এতে তবু যোগাযোগটা থাকবে ওর সঙ্গে। সুযোগ খুঁজছিল, পেয়েছে এবার। সুরলতা না বলতে পারুক তাকে, ফণি-ভূষণ নিজেই জানাবে ওকে দীর্ঘদিনের জমা ব্যথা।

ভেবেছিল, সন্ধ্যেয় সংসারের কোন কাজের ঝামেলা থাকে না— নিরিবিলিতে কথা কওয়া যাবে। তা আর হ'ল না সুরলতার। ওই সময়টা নিজেকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে সবাইকে ভুলে যেতে। যারা আছে, তাদের। যারা নেই, তাদেরও। এটা তার রোজের ধ্যান-ধারণা। ভুল করেছে ফণিভূষণকে ওই সময় ডেকে। তিনবার ভুল করার পর সচেতন হয়ে উঠেছে। নিত্যকার অভ্যেস তাকে বাধা দিচ্ছে। সুরলতা এ বাধাকে চেষ্টা করে সরাতে চায় না। চেষ্টা করে রাখতে চায় বরং।

দুপুরের দিকে ডাকলে। এলো ফণিভূষণ। সেই ঘরে সেই ভাবে সেই দিকেই বসল দু'জনে। সুরলতাকে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে ফণিভূষণ। দেখে দেখেও দেখার সাধ মিটছে না। নতুন করে আবিষ্কার করছে নিজের দৃষ্টিকে। যা দেখেছে আগে, সুরলতা তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর! কালো নরুণপাড় আর হাতঅলা সাদা জামায় রূপ যেন ফেটে পড়ছে। সোনার বিছে হারটা পুরুষ্ট গলায় স্থান পেয়ে ধন্য। হাতের ব্যাঙ্গেল দুটোও। সুরলতা নতুন করে সাজেনি। এটা প্রতিদিনের সাজ। তবু নতুন দেখাচ্ছে।

ফণিভূষণ সেজেছে। ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের মির্জাই পরেছে। আর মাটিতে কোঁচা লোটান লাল দাঁতপাড় ধুতি। সুরলতা দেখল একবার। সাজের বাহার দেখে কপাল কোঁচকালো, বলল, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকারি কথা আছে। বলি বলি করেও বলা হচ্ছে না।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফণিভূষণ বলল, তুমি যা বলতে চাইছো,

আমি জানি। ইচ্ছে করেই আমি বিয়ে করিনি। বাড়ির অসুবিধেটা মিথ্যে। তোমার রূপ তোমার গুণ তোমার ব্যক্তিত্ব আমার মন জুড়ে রয়েছে। সে মনে অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্থান নেই। থাকবেও না, থাকতে পারে না। তোমার জন্যেই এ বাড়িতে এসেছি ঘন ঘন। রয়ে গেছি!

কথাগুলো বিষ ঢালল যেন সুরলতার কানে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। টলতে টলতে শোয়ার ঘরে চলে গেল। ভেসে উঠল অনঙ্গ বাঁড়ুয্যের মুখ, ভেসে উঠল নন্দদুলালের মুখ। চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে শ্বশুর-স্বামীর এই দুটো মুখ।

খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। দেওয়ালে টাঙানো শাশুড়ীর ছবিটার দিকে তাকাল। ছবিই দেখে আসছে শুধু বিয়ের কনে থেকে। চাক্ষুস দেখা হয়নি। বিয়ের দুবছর আগে একমাথা সিঁদুর নিয়ে সতীলক্ষ্মী এয়োতি চলে গেছে। কি পোড়া কপাল তার! মাথায় সিঁদুর পরার সঙ্গে সঙ্গে মরণ হ'ল না কেন। এই সব শোনার জন্য বেঁচে ছিল।

আয়নার সামনে এলো। রূপ কি এখনও মরেনি? না, আয়নায় নিজেকে ভালো করে দেখা বন্ধ করেছে অনেক দিন। স্বামীহারা হওয়ার পর থেকে। কি দেখছে? রূপসী তরুণী? না, না। চোখের ভুল। তিপ্পান্নোর এ রূপ নয়। সে মায়াবিনী সে রাক্ষুসী। সকলকে খাচ্ছে এক এক ক'রে। পাঁচ বছরে মাকে, দশ বছরে বাবাকে। তের বছরে স্বামীকে। উনোচল্লিশে শ্বশুরকে। যে শ্বশুর তার সর্বস্ব ছিল—মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ী। ছেলের মতো ক'রে মেয়ের মতো ক'রে মানুষ করেছে।

গলার হার খুলল, খুলল হাতের ব্যাঙ্গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানায়। সমস্ত কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চিরকালের মত রূপ নষ্ট করে ফেলার ইচ্ছে করছে। ফণিভূষণের মনেও মোহ জাগিয়ে তুলছে এই রূপ।

তাক থেকে দেশলাই নিয়ে জ্বালাতে যাবে, গম্ভীর স্বর শুনে চমকে উঠল। দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে গেল মেঝেয়। বাইরে থেকে কারো কণ্ঠস্বর শোনেনি। বুকের ওঠা নামায়ই স্বর ওঠানামা করছে। তার নিশ্বাসে ধরা রয়েছে শ্বশুরের শেষ কথাগুলো। শুনছে।

—অনেক কথা শুনতে হবে বেঁচে থাকলে। অনেক কিছু সইতে হবে। মনে দাগ কাটতে দিও না কোন কথা। ক্ষমার চোখে দেখবে সকলকে। তুমি তপস্বিনী। তোমার মন মৃত্যুর চিন্তা করবে না একদম। আবার বলছি তোমায়—তুমি তপস্বিনী—তুমি তপস্বিনী—তুমি তপস্বিনী।

নিরাভরণা সুরলতা নরুণপাড় ধুতিও ছেড়েছে। বদলে, থান ধুতি পরছে। বেশীর ভাগ সময় ঠাকুর ঘরেই কাটায়। ফণিভূষণের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত বন্ধ একদম। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চলে অন্য লোক মারফত।

ফণিভূষণ আসত সুরলতার কাছে। সুরলতাকেই কিছু বলার জন্য। বলবো বলবো করে বলা আর হয়ে উঠতো না। মনের কথা মনেই থেকে যেত। একা পেত না। রঙ্গিয়া এসে পড়ত। দুর্বল মন ভয় তো থাকবেই। রঙ্গিয়াকে দেখে, ঘাবড়ে গিয়ে পালাত ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি, তখুনি। পাছে কেউ কিছু ভেবে বসে।

রঙ্গিয়া এ বাড়িতে যবে থেকে ঢুকেছে, তবে থেকে ঈর্ষার দানা বাঁধছে ফণিভূষণের মনে। বাঁধতে বাঁধতে এখন পাহাড়। কেবলই মনে হয়েছে এই মেয়ে সুরলতার কাছ থেকে তার পাওনা ভালোবাসা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এসেছে। সুরলতার লক্ষ্য নেই কারো ওপর। শুধু দিনেরাতে রঙ্গিয়া-রঙ্গিয়া করে পাগল।

এ আপদকে বাড়ি থেকে দূর করতে না পারলে, খেয়ে সুখ নেই,

শুয়ে ঘুম নেই। এ মেয়ে তার সুখের পথে বিষের কাঁটা। যে কোন উপায়ে নির্মূল করতে হবেই একে।

সুরলতা বলেছে, ঠাকুরপো! ওর মধ্যে আমি নিজেকেই দেখি। ছোটবেলায় বাপ-মা হারিয়েছি। হারানোর কথা আমার অজানা নয়। রঙ্গিয়ার কথা শুনে ঘরে থাকতে পারিনি একদণ্ড। ভেতরটা ছটফট করেছে। ওকে নিয়ে এসে তবে নিশ্চিন্ত। ও লেখাপড়া শিখবে, বিষয় চালানো শিখবে। দেখবে, ওকে আমি বাঙালী মেয়ে তৈরী করবো একেবারে। আমার অবর্তমানে ওরই তো এসব সম্পত্তি।

যতসব হাড়-জ্বালানো কথা। রাস্তার কুড়নো মেয়ে নাকি উনি হবেন। মাথাটা গেছে। মুখখানা বিকৃত করে, বিকৃত গলায় হেসে ফণিভূষণ স্থানত্যাগ করেছে। পুষ্যি নিতে হয় নিক না একটা ভালো ঘরের ছেলে-মেয়েকে। তারও তো ভাইপো-ভাইঝি আছে। তা নয়, পাগলামো খালি। এ মেয়ে আধিপত্য করবে তার ওপর। সে গুড়ে বালি। সারাদিন সারারাত ফণিভূষণ মুণ্ডপাত করেছে রঙ্গিয়াকে মনে মনে।

লোক লাগিয়ে রঙ্গিয়াকে কোন পরদেশে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঝিয়েদের সঙ্গে পরামর্শ চলল। ওদের মদত পাওয়া যাবে। রঙ্গিয়াকে বাড়ির বাইরে বের করতে হবে কিন্তু। একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার কথা জানাল সুরলতাকে। ইনিয়েবিনিয়ে অনেক কিছু বোঝাল। রাস্তায় ঘোরা, পাহাড়ে ওঠা, গাছে ওঠা, পুকুরে সাঁতার কাটা মেয়ে। ধুলোমাটি মেখে ওদের জীবন, ওদের দেহ। এভাবে আটকে রাখলে অসুস্থ হয়ে পড়বে যে। সবার ধাতে আবার সব সুখ সয় না। খোড়োচাল থেকে পাথুরে ছাদের বাড়ি, ভূমিশয্যা থেকে পালঙ্কশয্যা। সইয়ে সইয়ে আনতে হবে, না'হলে বুনো পাখি পোষ না মেনে শেকল কেটে পালিয়ে যেতে পারে শেষে।

সুরলতা শুনেছে। মানুষটা কি হীনমনা! কতটুকু মন। ভেতরে

ভালবাসার লেশমাত্র নেই। থাকলে না উজাড় করে দেবার ইচ্ছে হবে অপরকে। অপরকে ভালোবেসে তবেই না তৃপ্তি পাবে। ভেতরটা কত শূন্য। কারো কিছু পূর্ণ দেখলে, ঈর্ষায় চোখ দুটো জ্বলে ওঠে দপ করে। এ মানুষের চোখের সামনে থাকলে রঙ্গিয়া শুকিয়ে যাবে। এর উষ্ণ নিশ্বাস সহ্য করার ক্ষমতা ওর হয়ে ওঠেনি এখনো।

ভেতরে নানা প্রতিক্রিয়া দাপাদাপি করলেও, স্নুরলতার মুখে কোন চিহ্ন ফুটে ওঠেনি। ফণিভূষণ ভেবেছে সার্থক হলো বোঝানো। আনন্দ চাপতে না পেরে একরকম ছুটেই চলে গেছে কিষাণীর ঘরে।

চৌকির ওপর মাদুর পাতা। কিষাণী আর আদরমণি বসে। মাঝখানে ধামি ভর্তি মুড়ি, দুজ'নে খাচ্ছে। একবার মা মুখে তুলছে, একবার মেয়ে। মুড়ির সঙ্গে পাটালির টুকরোটাও চিবিয়ে নিচ্ছে।

সুখবর দিল ফণিভূষণ। ডগমগ হয়ে উঠল কিষাণী। দাদাবাবু, আমার আদরমণির বরাত ফিরবে এবার, তোমার দয়ায়।

রঙ্গিয়া সরলে তার জায়গায় আদরমণি বসবে।—কিষাণীর মাথায় ঢুকিয়েছে ফণিভূষণ। দাবি তারই মেয়ের। পুরনো ঝি! আদরমণি দেখতে এমন কিছু খারাপ নয়। বৌদি আদরমণিকেও তো পুষ্যি নিতে পারে। ঘরের থাকতে বাইরের। অবিচার আর কাকে বলে।

একবার একটা মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে উঠেছে কিষাণী। দাদা-বাবু! কিষাণীর কাঁপা গলা। রঙ্গিয়ার জীবনের ভয় নেই তো? আমিও যে মা।

—পাগলী কোথাকার। কোন ভয় নেই। অন্য জায়গায়—সেও খুব বড়লোকের বাড়ি—বুঝলি?

—বুঝেছি দাদাবাবু। আদরমণিকে কাছে টেনে বুকে চেপে ধরল কিষাণী। চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নামছে। কিষাণী হাসছে। আদরমণির চিবুক ধরে বলল, রাণী হবি। রাণী রাণী রাণী।

আদরমণি রঙ্গিয়ারই সমবয়সী প্রায়।

ক'দিন ধরে লক্ষ্য করেছে স্নুরলতা, আদরমণিকে ঠেলে ঠেলে

পাঠিয়ে দিচ্ছে কিষাণী তার কাছে। যা না! আ ম'লো ওই তোর আসল মা রে। নামে মাত্র পেটে ধরেছি। রঙ্গিয়া যেমন, তুইও তেমন। তোরই আদর বেশী। রঙ্গিয়ার আগে থেকে রয়েছিস। রয়েছিস কি, হয়েছিসই তো এই বাড়িতে।

শুধু এই নয়, রঙ্গিয়াকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য কি ঝুলো-ঝুলি। আজকের দিনটা বেড়িয়ে নিয়ে আসি না বৌদি। রঙ্গিয়া কেমন মনমরা হয়ে রয়েছে। আদরমণির তো বাড়িতে থেকে অভ্যাস, থাকুক না নাহয় তোমার কাছে। রঙ্গিয়াকে ছু'একবার বাইরে নিয়ে যাওয়া-যাওয়ি করলে, বাড়িতে মন বসবে সহজে।

খেলতে খেলতে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রঙ্গিয়া। কিষাণীর দিকে তাকিয়েই ভূত দেখছে যেন। দিনের বেলায়ও ভয় পেয়ে ছোট ছোট ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে সুরলতাকে। কোলের কাছে মুখ গুজে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। যাতে কিষাণীর মুখ দেখতে না হয়, চোখাচোখি না হয়।

রঙ্গিয়ার রকমসকমে কিষাণী ভড়কে গেছে। শয়তান মেয়েটা বুঝতে পারে নাকি সব? বুঝতে পেরেছে নাকি?

—যাবি? মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল সুরলতা।

—না। তার 'না'টাকে জোর করার জন্য, এপাশ থেকে ওপাশ আর ওপাশ থেকে এপাশ মাথা ঘোরাল ছুবার।

—আজ যা। কাল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়ে দোব'খন। সুরলতা মৃত্যু হাসল কিষাণীর দিকে চেয়ে।

কাল কাল করে অনেক কালই চলে গেল। রঙ্গিয়ার কালের ভয় কেটে গেল। কিষাণীকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে সুরলতা, ও যখন যেতে চায় না, পিড়াপীড়ি করে লাভ নেই কোন।

সুরলতাকে রাজী করানো গেছল। মেয়েটাই বেঁকে বসল। যত আক্রোশ ঝাপিয়ে পড়ল রঙ্গিয়ার ওপর ছু'জনের। ফণিভূষণের কিষাণীর। খেলতে গিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল মেয়েটা চক্ষের

নিমেষে, খোঁজাখুজি করেও পাওয়া গেল না, হয়তো বা এ বাড়ি ভালো লাগত না বলে পালিয়ে গেছে কোথাও কিষাণীর চোখে ধুলো দিয়ে, ফাঁকাবাজ মেয়ে, রাস্তাঘাট চিনতে তো আর বাকি নেই—ফণিভূষণের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো একলা ঘরে বসে বসে, শুয়ে শুয়ে—রাতে ঘুমের ঘোরেও কপচেছে। ভেস্তে গেল সমস্ত।

হায় হায় করে কপাল চাপড়েছে কিষাণী। আর আদরমণির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে, কি পোড়া কপাল। কি পোড়া কপাল!

ফণিভূষণ কিষাণীর মত ভেঙ্গে পড়েনি। হাহুতাশ করতেও সরম এসেছে তার। মানুষের অসাধ্য কি এমন কাজ নেই। রঙ্গিয়ার ব্যাপার তো তুচ্ছ। অতি তুচ্ছ। একটায় হ'ল না আর একটা, আর একটায় হ'ল না অন্য একটা। একটা মতলবে একপলকে কাজ হাসিল হবে তার নিশ্চয়। এক সময়ে। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এক পা-ও নড়বে না।

সাবধান হয়েছে সুরলতা।

রঙ্গিয়াকে নিয়ে ফণিভূষণের মনোভাব জেনেছে; জেনেছে কিষাণীরও মনোভাব। চোখে চোখে রেখেছে রঙ্গিয়াকে। রঙ্গিয়ার ওরা শত্রু না মিত্র—তা নিজেদের হাবভাবে কথাবার্তায় ওরা নিজেরাই প্রকাশ করে ফেলছে। এ থেকে সুরলতা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। পৃথিবীতে প্রায় সব মানুষ নিজের স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। নিজে কি, তা সে নিজেই জানিয়ে দেয়। চোখ থাকলে দেখা যায় মন থাকলে বোঝা যায়।

আরো একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকের ভেতরে বিপদের আঁচ লাগে। সেখানে বয়সের হিসেব-নিকেশ নেই। ছোট হোলেও সে আত্মরক্ষার জন্য যাকে ভালো বোঝে, জড়িয়ে ধরে। যে মানুষের কাছ থেকে বিপদ আসবে—তাকে দেখে ভয় পায়। তার কাছে যেতে বললেও যেতে চায় না কিছুতেই। সেটা দেখেছে রঙ্গিয়ার

মধ্যে। কিষাণীর পাষাণী মূর্তি দেখেছে রঙ্গিয়া। তাকে আঁকড়ে ধরেছে। তখুনি সুরলতার মনে হয়েছে, ওর কাছে কিছুতেই যাবে না মেয়ে। কিষাণীকে চিনতে পেরেও, কিষাণীর সঙ্গে ফণিভূষণের যোগসাজস আছে—ত্ব'জনের একই রকমের কথার সূত্র ধরে বুঝতে পেরেও, রঙ্গিয়াকে যেতে বলেছে, জানে—রঙ্গিয়া যাবে না, হাজারো বার বললেও না।

রঙ্গিয়াকে কাছ ছাড়া করে না সুরলতা একবারের জন্যও। ঠাকুর ঘরে গেলেও সঙ্গে নিয়ে যায়। পাশে বসিয়ে রাখে। বলে, কথা কইবি নে একদম। বসে বসে ছাখ। কেমন চোখ কেমন নাক কেমন জিভ। হাতের খাঁড়াটা কেমন।

রঙ্গিয়া কথার উত্তর না দিয়েই চেয়ে থাকে দেবীর দিকে। সুরলতা খুশী। তার আদেশ পালন করছে অক্ষরে অক্ষরে।

পূজোপাঠ ধ্যানধারণা শেষ করে চেয়ে দেখে, ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝেয়। দেবীর চরণের জবা ফুল নিয়ে মাথায়-গায়ে বুলিয়ে দেয়। কালী শুয়ে আছে।

কিশোরী রঙ্গিয়া তরুণী হ'ল।

পাত্রস্থ করার জন্য সুরলতা দশবার এগিয়েছে, পঞ্চাশবার পিছিয়েছে। দেবে কি না দেবে। তার মতো ভাগ্য যদি হয়। নিদারুণ যন্ত্রণা। কে যেন পিঠে চাবুক মারল সপাং ক'রে। অশুভ চিন্তা করতে করতে যে অশুভই হয়ে যায়! সুরলতা একি ভাবছে! চোখে জল টল টল করে উঠল। চোখ বুজে তুহাত জোড় করে প্রার্থনা করল। মঙ্গলময়ী! মঙ্গল করো ওর। যদি কোন অমঙ্গলও থাকে—আমায় দিও, আমায় দিও!

শেষ অবধি স্থির করল বিয়ে। চতুর্দিকে শত্রু। সুরলতার যদি কিছু হয় কে দেখবে? অগাধ জলে পড়ে হাবুডুবু খাবে রঙ্গিয়া। ওর জীবন নিয়েও টানাটানিটা বেশী সম্ভব। মাথার ওপর একজন সৎ-অভিভাবক চাই।

চেষ্টা চরিত্র চলছে। মাঝে মাঝে পাত্রপক্ষেরা দেখতে আসছে, অপছন্দ করেনি কেউ। কালো হলেও মুখখানা এমন মিষ্টি যে রঙ্গিয়াকে দেখে, অন্য দুধে-আলতা গোলা মেয়েকে আর চোখে ধরছে না নাকি। সুরলতার কাছে এটা শুভ সংবাদ। শুভ সংবাদ হলেই সব ঘরে সব পাত্রের সঙ্গে দেয়া যায় না। যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে, ছেলে কেমন, ঘর কেমন। যেটা সুরলতার পছন্দ হবে, রঙ্গিয়া সেই ঘরেই ঘরণী হবে।

অনবরত এইসব জল্পনা-কল্পনা নিয়ে বাড়ি যখন গুলজার, সেই সময় আনাগোনা শুরু হোল ফণিভুষণের বেশী ক'রে। আসে কথা কইতে সুরলতার সঙ্গে, কিন্তু ঘরে রঙ্গিয়াকে দেখলেই কিরকম হয়ে ওঠে, বেরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। প্রায়ই ঘটছে এটা। সুরলতার নজর এড়ায়নি।

বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব ক'রে উঠেছে। সর্বনেশে মানুষ, কে জানে কোন বিপদ না ঘটায় আবার। শাসিয়ে দেবে বলে ডেকেছে। ফণিভূষণের মুখে যা শুনল, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না আর। তার আকর্ষণেই আছে এ বাড়িতে ফণিভূষণ!

সকলেই দেখল বিয়ের তোড়জোড় করতে ফণিভূষণ খুব ব্যস্ত। সকলেই শুনল রঙ্গিয়া সুখী হলে—পৃথিবীতে একজনই আছে, যে রঙ্গিয়ার চেয়েও বেশী সুখী হবে, সুরলতার চেয়েও বেশী খুশী হবে—সে ফণিভূষণ চাটুজ্যে।

সে ফণিভূষণ চাটুয্যে!

বিষদাঁত ভাঙা নয় ওর। দিনরাত বিষের জ্বালায় ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে। এ বিষের খবর বাইরের লোকে না জানলেও সুরলতার জানতে বাকি নেই। সুরলতার ধারণা রঙ্গিয়ার ব্যাপারে কোনদিনই ও আপোস করতে পারবে না। সুখী হওয়া খুশী হওয়া দূরের কথা। ও যদি এত তৎপর না হত, এত ঢাক পিটিয়ে ডাইনীর ভালোবাসা

প্রচার না করে বেড়াত, তাহলে বরং সুরলতা নিশ্চিন্ত হতে পারত, স্বস্তি পেত।

রঙ্গিয়ার মিষ্টিমুখ বলে যারা নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েছিল, একে একে সরেছে তারা। হাজার হোক সাঁওতালী রক্ত বইছে দেহে। বাঙালী বামুনের ছেলে ঘরে তুলে আনলে, জাত-সমাজ বলে আর কিছু থাকবে না যে।

কেউ কেউ বলল, জাত-সমাজ খোয়াতে রাজী একটা সর্তে, সমস্ত বিষয় লেখাপড়া করে দিতে হবে।

সুরলতার মনে হয় এসবের নেপথ্যে ফণীভূষণের বুদ্ধি কাজ করে চলেছে।

সুরলতার জিদ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। বিয়ে দেবার স্থির করেছে যখন, তখন বিয়ে দেবেই। পাত্র নির্বাচন করেছে নিজেই। ছেলে ভালো, ঘর ভালো,—ভালো নয় শুধু অবস্থা। আর্থিক অবস্থা ভালো নয় বটে, কিন্তু মনের অবস্থা তুলনাহীন। অতি উদার, আকাশের মতো বিশাল। জাত-বেজাত ভেদাভেদ নেই। সকলকেই আশ্রয় দিতে চায়, সবাই যে একই ঈশ্বরের সন্তান, সকলেরই রক্ত লাল।

এইরকম পাত্র চেয়েছিল সুরলতা। ঘেন্না করবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না রঙ্গিয়াকে কখনো। নির্লোভী, বিষয় চায়নি। বিষয় চায়নি বলেই, অর্ধেক লিখে দেবে সুরলতা। অর্ধেক থাকবে রঙ্গিয়ার।

সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে, কিন্তু ফণিভূষণের ভয় যাচ্ছে না, আরো বাড়ছে। কি করে ফণিভূষণের বিষাক্ত নিশ্বাসের আওতা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করা যায়? কি করে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়? কি ক'রে—রাত্রে সারারাত মথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবে।

চিন্তার জটের মধ্যে দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা কথাই ঘোরা ফেরা করে কেবল। ফণিভূষণের মন-দৃষ্টি-চিন্তা—সমস্ত কিছুকে

ঘুরিয়ে রাখতে হবে অন্যদিকে। রঙ্গিয়ার কোন অনিষ্ট করার সুযোগ যাতে না পায়। রঙ্গিয়ার নামটা পর্যন্ত যাতে ওর মনে না আসতে পারে একবারের জন্য।

এটা করার জন্য জীবন-রঙ্গমঞ্চের একটা বিচ্ছিরি অঙ্কে একটা অবাঞ্ছিত দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে সুরলতাকে। যা কল্পনাও করেনি কোনদিন। ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে। এসমস্ত করার আগে মৃত্যু এলে ভাল হ'ত। ভালো হ'ত ভাবতে ভালো লাগছে। রঙ্গিয়াকে স্থিতি না করে মরতে ইচ্ছে নেই সুরলতার প্রকৃত। সুরলতা যে রঙ্গিয়ার মা। মেয়ের সুখের জন্য মাকে সব কিছু করতে হবে।

ডাকিয়ে পাঠাল ফণিভূষণকে।

এলো। অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ফণিভূষণ বিস্মিত। দেখছে সুরলতাকে। যত বয়েস বাড়ছে, তত আরো সুন্দর আরো কমবয়সী ঠেকছে ফণিভূষণের চোখে। বহুদিন বাদে আবার দেখা। কর্ত্রীর ইচ্ছেয় দেখা।

সুরলতা পা ঝুলিয়ে বসে আছে খাটে। ঠোঁটে হাসির প্রলেপ, হাওয়ায় এলেমেলো চুল উড়ছে। মাথার ঘোমটা খোলা।

—ঠাকুরপো যে নতুন দেখলে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো না! উঠে টেনে দেবো?

—না না। বসলো চেয়ারে ফণিভূষণ।

—ছ্যাখো, শুনছি অনেক কথা।

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ফণিভূষণের। তার ষড়যন্ত্রের কথা কিছু কি শুনেছে নাকি? গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোঁক গিলে গিলে ভেজানোর চেষ্টা করছে। সোনার সাঁওতালকে ক্ষেপিয়ে তোলার কথা কি কানে এসে পৌঁছেছে? রঙ্গিয়ার জ্ঞাতি কাকাদেরও ক্ষেপিয়ে তোলার কথা? সেটা কেমন করে সম্ভব? টাকায় মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আরো অনেক কিছু লোভ দেখানো হয়েছে। কথা

দিয়েছে ওরা প্রকাশ করবে না। জান যাবে তবুও না। প্রকাশ করলে তো ওদেরও ক্ষতি।

ফণিভূষণ অস্থির হয়ে পড়েছে।

চেয়ারটা যেন অগ্নিকুণ্ড! আগুনের ওপর বসে আছে সে। গোটা দেহটা জ্বলেপুড়ে গলে যাবে বুঝি।

—যে কথা বলার জন্য ডাকা, সেটা বলবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু না বললেও চলে না। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি।

ফণিভূষণের বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। জিভটাও শুকিয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছে তাহলে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওরা। তরী তীরে এসে ডুবল শেষে!

নিজের দিকে লক্ষ্য রাখো। শরীরটা শুকিয়ে গেছে আগের থেকে। তুমি জানো, তুমি আমার ডানহাত। অসুখবিসুখ হলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। আমার অনুরোধ, শরীরের যত্ন নাও!

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ফণিভূষণ। ধরা পড়েনি। কর্ত্রী সদয়। নজর পড়েছে। বলল, বৌদি নানান খাটাখাটুনির কাজ। একটু আধটু ওরকম হয়ই। ভয়ের কিছু নেই। বিছানায় পড়বো না। তবে জ্যোতিষীরা বলেছে—আমি কাজ করতে করতে কথা কইতে কইতে মরে যাবো হঠাৎ।

ষাট্‌ বালাই! শত্রু মরুক। ওকথা আমার সামনে কোনদিন আর মুখে আনবেনা বলছি। যত সব অলক্ষুণে কথা। আর শোন! অন্তত রোজ একবার করে দেখা ক'রে যাবে। কেমন লক্ষ্য রাখছো দেখবো। এসো। আজ আর আটকাবো না।

বৌরাণীর আদেশ পালন করবো। নিশ্চয়। হাসতে হাসতে বলল ফণিভূষণ।

বৌরাণীর নয়, বৌদির।

দুজনেই জোরে হেসে উঠল।

ফণিভূষণ চলে যাওয়ার পর নিজের মনে মনে বলল সুরলতা।

এই ভাবেই প্রতিদিন 'আটকাবোনা' বলে ফণিভূষণের মনকে আটকে রাখতে হবে। রঙ্গিয়ার শুভ পরিণয় শেষ না হওয়া অবধি।

ফণিভূষণ যে কত বুদ্ধি ধরে, কত ধুরন্ধর—সেটা আরো ভালো করে বুঝল সুরলতা পরে। তখন আর করার কিছু নেই। তলায় তলায় ও করে রেখেছিল সব। মোক্ষম আঘাত হানার জন্য করণীয় যা যা—সব।

স্তব্ধ বিষণ্ণমুহূর্তে সুরলতা হতভম্ব হয়ে গেছল। হয়ে গেছল হতবাক হতবুদ্ধি।

ফাগুনের গোধূলি বেলা।

লগ্ন ঠিক করেছে কুলপুরোহিত। তিনমহলের আঙিনায় জরির কাজ করা। লাল ভেলভেটে মোড়া বরের সিংহাসন। ফুলে ফুলে দেবতার রথ সাজানো হয়েছে যেন। গোটা বাড়িটায় ফুলের ঝালর ঝুলছে। দেয়ালে জানালায় দরজায় বাইরে ভেতরে। বাইরে কার্ণিশে প্রদীপের মালা। আকাশের তারা মাটির বুকে মেশার জন্য কত ছোট হয়ে নেমেছে প্রদীপের শিখায়।

আঙিনায় সামিয়ানা খাটানো। কাঁচের ঝাড় ঝুলছে চারকোণে-মাঝখানে। দালানের চতুর্দিকে হ্যাজাক আলোর জ্যোৎস্না। সন্ধ্যের আগে থেকে রাতের অন্ধকারকে এ বাড়ির আনাচে কানাচে আসতে নিষেধ করছে আলোর প্রহরা।

বর এসে বসে আছে ফুলের সিংহাসনে। মেঝেয় ধবধবে চাদর বিছানো সতরঞ্চির ওপর লোকে-লোকে ছয়লাপ। গাদাগাদি হয়ে বসে আছে ছেলে-বুড়ো সব বয়েসী। গানের আসর চলছে। মাঝ বরাবর সারেঙ্গী-তবলার বাজনা দ্রুতগতিতে চলছে। বাজিয়েরা তালের সঙ্গে মাথা নাড়ছে, দুলছে। মধুকণ্ঠী বাইজী ডানহাত ডান কানে চেপে ধরে বাঁহাতে ভাও বাতলাচ্ছে গানের সঙ্গে।

কিধার সে আরহে হ্যাঁয় তেরে দিল,
কিধার জা রহে হ্যাঁয় তেরে দিল (ফিন)।
জিধার সে আরহে হ্যাঁয় মেরে দিল,
উধার জা রহে হ্যাঁয় মেরে দিল।

এ বংশের ধারা মেয়ের বিয়ে ছেলের বিয়েতে বাইজীর গান। সুরলতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে সে-ধারা। হলুদ ভেলভেটের পরদার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখল একবার সুরলতা। সমস্ত ঠিক আছে বরের কাছে দাঁড়িয়ে ফণিভূষণ। চোখাচোখি হোল: দু'জনেরই ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল সকলের চোখের অগোচরে।

মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল।

বর উঠল সিংহাসন থেকে। ভেতর মহলে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে।

হঠাৎ বাইরের কোলাহলে ভেতরের লোকের হৃৎকম্প। শুভ কাজে না বিঘ্ন ঘটে।

দল দল সাঁওতাল বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। হাতে হাতে তীর-ধনুক-টাঙি-সড়কি লাঠি। বাতাস তোলপাড় ক'রে তুলেছে সমবেত উত্তেজিত কণ্ঠ। তাদের মেয়ে রঙ্গিয়াকে তাদের চাই। ওর বিয়ে দেবে তারা নিজেদের মধ্যে। দেবে না অন্য কারো সঙ্গে। হোক না সে যত বড়। রঙ্গিয়াকে না পেলে আগুন ধরিয়ে দেবে বাড়িতে। খুন করে ফেলবে তারা সকলকে। জীবনের পরোয়া করে না তাদের কেউ। অন্যায় বরদাস্ত করবে না কিছুতেই।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাইছে ওরা। দরোয়ান গেট বন্ধ ক'রে দিলেও, গেট ভেঙে ফেলছে। রুখতে পারা যাবে না বেশীক্ষণ।

ফণিভূষণকে ডাকল সুরলতা।—এসব কি? লোকজন দিয়ে এদের সরিয়ে ফেলতে পারছো না? না সরালে ওদের পরিণাম খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি। ওরা হামলা করবে, আর আমি চুপ

করে বসে থাকবো, এ যদি কেউ মনে ক'রে থাকে, সে মস্ত ভুল করেছে জানবে। একটা কিছু বিঘ্ন আসবে—এটা আমার মন বলছিল। দরোয়ানের হাতে বন্দুক দিয়ে রেখেছি—তাই। পাইকদের লাঠি নিয়ে তৈরী থাকতে বলেছি।

কাঁচুমাচু মুখ করে বলল ফণিভূষণ, বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে বৌদি। রাগের বশে রক্তগঙ্গা না বইয়ে একটা মীমাংসায় এলে কি ভালো হয় না?

কি মীমাংসা? রঙ্গিয়াকে ওদের সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে?

তা হবে না।

রঙ্গিয়া তো ওদের মেয়ে?

না। ও এখন আমার।

কিষাণীর সঙ্গে দৌড়ে এলো রঙ্গিয়া। সুরলতাকে শান্ত না করলে অনেক প্রাণ অকালে নষ্ট হয়ে যাবে। আর নষ্টের কারণ হবে রঙ্গিয়া। কিষাণী বিপদের কথা কানে তুলেছে সাজের ঘরে এসে। রঙ্গিয়ার সাজসজ্জা শেষ হয়েছে সবে। শুনেই বুক কেঁপে উঠল। হাতের কাজললতাটা অন্যমনস্কভাবে ফেলে রেখেই এসেছে। বলল, মা। আমি তোমারই মেয়ে। আজ ওদের সঙ্গেই যেতে দাও। ওরা বুঝবে আমার কথা। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার আসবো। নিশ্চয় আসবো তোমার কাছে। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তিন সত্যি করছি।

যেমন দৌড়ে এসেছিল, তেমনি দৌড়েই চলে গেল গেটের সামনে। ফণিভূষণও দৌড়ল। গেট খুলে দিতে বলল দরোয়ানকে

বাঁশের সিংহাসন এনেছে রঙ্গিয়ার কাকা মিশান্নু। সিংহাসন এগিয়ে নিয়ে এলো ওর দলবল। সিংহাসনে ওঠার আগে এক এক করে সমস্ত গয়না খুলে দিল রঙ্গিয়া ফণিভূষণের হাতে।

সিংহাসন মাথায় করে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল ওরা। পেতলের বাঁশী বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে সোনার। সোনার রঙ্গিয়ার

বাল্য সঙ্গী, পড়শী। সাত বছর বয়েসে ছাড়াছাড়ি। দীর্ঘ তেরো বছর পর আবার দেখা। সে-ই বিয়ে করবে। মিশামু ওর সঙ্গেই বিয়ে দেবে বলে নিয়ে এসেছে। ওরও সাঙ্গপাঙ্গরা নাচতে নাচতে বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলছে।

রঙ্গিয়ার চলে যাওয়া দেখল সুরলতা। দালানে পাথরের থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। যেন থামেরই গা কেটে তৈরী করা একটি পাথর মূর্তি। চোখের পাতা পড়েনি খানিক। স্থির দৃষ্টি। চোখে জল নেই। শুকনো খটখটে। মুখে কথা নেই, বোবা। যে আঘাত আশা করেনি, সে আঘাত পেয়েছে। যে ঘটনা ভাবেনি, সে ঘটনা ঘটেছে। সবেরই চরম। চরম বলেই বোধ হয় সমস্ত স্নায়ু শিথিল, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল, সমস্ত শক্তি নিস্তেজ।

আসর ফাঁকা, একজনও নেই। রাস্তা ফাঁকা, একজনও নেই। বাড়িময় বিষাদের ছায়া। ওই রকম অবস্থা দেখে সুরলতার কাছে যায়নি কেউ ভয়ে। কিষাণী আদরমণিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আদরমণির বিয়ে হয়ে গেছে সাঁওতালী ছেলের সঙ্গে। রঙ্গিয়ার বিয়েতে এসেছে।

আদরমণি ডাকল, মা! ভেতরে চল। মা, মা, ও মা। চিৎকার করে ডেকে উঠল। সম্বিৎ ফিরে পেল সুরলতা। চনমন করে তাকাল চতুর্দিকে। রঙ্গিয়া কি ডাকল তাকে? দেখল আদরমণিকে। তখনো ডাকছে ও।

সুরলতার ঠোঁট কাঁপছে, কাঁপছে সর্বাঙ্গ। চোখের পাতাও কাঁপছে। ভিজে ভিজে উঠছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে এক এক ক'রে। ছুটে চলে গেল ঠাকুর ঘরে। আছড়ে পড়ল মেঝেয়। মনে হচ্ছে দেবীর ঠোঁট দুটো নড়ছে। ওই ঠোটের ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে আসছে যেন রঙ্গিয়ার কণ্ঠ—নিশ্চয় আসবো তোমার কাছে। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়।

এই নিরানন্দের দিনে সবচেয়ে যদি কারো বেশী আনন্দ হয়ে

থাকে, সে ফণিভূষণের। ফণিভূষণ দায়ী। কূটবুদ্ধির জাল বোনা তার নিখুঁত্। সার্থক হয়েছে মিশান্নুকে টাকা দেওয়া। মিশান্নু তার শক্ত ফাঁদে পা দিয়েছে। বেরুবার সাধ্যি নেই আর কোনদিক দিয়েই। রঙ্গিয়াকে নিজের কাছে রাখলে, ওই সম্পত্তির মালিক হ'তে পারবে একদিন মিশান্নু। রঙ্গিয়ার সুখের জন্য সুরলতা সে ব্যবস্থা করতে বাধ্য। ফণিভূষণ সুরলতাকে দিয়ে এটা করাবেই করাবে। সুরলতা তো তার মুঠোয়। যাদের ঘরের মেয়ে তাদের কাছ থেকে এরকম নিষ্ঠুরের মতো ছিনিয়ে নিয়ে আটকে রাখাটা ফনিভূষণের প্রাণে বড় লাগে। তাই পরামর্শ দেয়া। পাঁচজনের মঙ্গলই তার কাম্য।

সোনারকে সঙ্গে নিতে বলেছে, ওর স্যাঙাৎ অনেক। ও দলে থাকলে সাঁওতালদের একটাই শক্তিশালী বড় দল হয়ে যাবে। বিপক্ষে থাকবে না কেউ। ও বিগড়োলে বরং মুশকিলই হতে পারে। নিজেদের মধ্যে বেধে গেলে সুরলতারই সুবিধে হয়ে যাবে।

ছেলেটার একটা দুর্বলতা আছে রঙ্গিয়ার ওপর। কেউ না জানুক, জানে ফণিভূষণ। ওর ছোটবেলার সঙ্গিনীকে ভুলতে পারেনি আজো। আসে মাঝে মাঝে। দূরে—পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে যায়। যেন ওই দিকেই এসেছে এমন ভাব।

পরামর্শের সব টোপই গিলেছে মিশান্নু অনায়াসে। বিশেষ কোন বেগ পেতে হয়নি ফণিভূষণকে।

এত কাণ্ড সত্ত্বেও কি ফণিভূষণ সুরলতার হৃদয় জয় করতে পেরেছিল? হ'তে পেরেছিল কি অনঙ্গমহলের একছত্রাধিপতি? না। এর পর যে ঘটনা ঘটল, তাতে অনঙ্গমহল থেকে বিদায় নিতে হ'ল ফণিভূষণকে চিরকালের জন্য।

সে ঘটনা বড় মর্মন্তুদ বড় করুণ!

সোরানের বন্ধুদের ঘাড় থেকে মাথা থেকে বাঁশের সিংহাসন এসে নামল সাঁওতাল পাড়ায়। হাত বাড়িয়ে দিল সোরান রঙ্গিয়ার

হাত ধরার জন্য। নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। ওকে ত সে-ই জয় করে আনল।

বন্ধুরা শুভ-কামনা করে গান গেয়ে উঠল। গলায় গলা মেলাল সোরান।

নতে নতে 'মারংবুরু'
নতে কয়াক মে।
নতে নতে 'জাহেরএরা'
নতে বেঙ্গাত মে।
প্রণাম মারংবুরু
প্রণাম তোমায়

রাখো মোরে আনন্দে
তোমার কৃপায়।
প্রণাম জাহেরএরা
প্রণাম তোমায়
আশীর্বাদ দাও শিরে
তুমিই সহায়।

এত আনন্দ নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল মিশানুর একটা মাত্র কথায়, রঙ্গিয়া আমার ঘরে থাকবে এখন। তোর ঘরে যাবে কি না— পরে বিচার করে দেখা যাবে।

—ঠিক আছে বিচার করেই দেখ তুই। যা অন্যায় করলি তুই, এর সাজার জন্য তৈরী হয়ে থাকিস। সোরানকে ধোঁকা দেয়ার লোক জন্মায় নি এখনো। সোরান আছে তো মাটির মানুষ— সাত চড়ে মুখে রা নেই। কিন্তু ক্ষেপে গেলে কারো খাতির রাখার ছেলে নয় সে।

চলে যাওয়ার সময় ডানহাতের বজ্রমুষ্ঠি আকাশের দিকে তুলে ধরে, চিৎকার ক'রে সকলকে শুনিয়ে বলে গেল সোরান, আবার

বলছি তোকে বেইমান। কথা দিয়ে কথা রাখলি না। তোর কি হাল করি ছাখ। সহজে ছাড়ার পাত্র নয় এ বান্দা।

এ বান্দা কেমন মিশানুর অজ্ঞাত নয়। মিশানুরই ঘরের ব্যাপার। বড় ছেলের প্রেমিকাকে নিয়ে পাশের গাঁয়ের চ্যাংড়া ছোঁড়াটা নিয়ে পালাল। সে কি কাণ্ড সোরানের। ওর রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই কারো। গ্রামের অপমান, গ্রামের বেইজ্জতি, মজা দেখাচ্ছে।

সোরান একাই একশো লোকের মহড়া নিতে পারে। লাঠি টাঙি তীরধনুক সড়কি—যেটাই ওর হাতে পড়ুক, জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। ওর অস্ত্রের আঘাত থেকে নিস্তার নেই কারো। প্রাণ নিয়ে ফেরা দুষ্কর!

বাছাই করা সঙ্গী নিয়ে গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের গাঁয়ে।

আচমকা আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না ওপক্ষের লোকেরা। ঘুমন্ত মানুষদের হুঁশ আসার আগেই কার্য শেষ। বন্ধুর প্রেমিকাকে বন্ধুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল নিজে। সাহস থাকে তো, শক্তি থাকে তো, এগিয়ে আয়! মরদ কেউ থাকিস তো লড়ে যা।

দু'চারজন এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিল। তাদের যে হাল করল আঘাতে আঘাতে সে আর বলার নয়। সারা শরীর ঝুঁঝিয়ে রক্ত ঝরে লুটিয়ে পড়ল ওরা। সড়কি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এই হাল করেছে। বুকটা গলাটা বাকি রেখেছে শুধু। আধমরা করেছে, একেবারে মেরে ফেলে নি।

এটা নাকি ওর রাগের খেলা। এতে ও তৃপ্তি পায় প্রাণ ভরে। আহতদের তাজা রক্ত সারা দেহে মেখে উন্মত্ত উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করেছে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

রাগলে কি যেন একটা ভর করে ওর ওপর। দৈত্যদানব কি অপদেবতা, যা হয় একটা কিছু নিশ্চয়। এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।

তা না হ'লে মানুষ যে ওরকম হয়, হ'তে পারে, এমন দেখা যায় না। ওকে দেখলে অমন দুর্বল হয়ে পড়ে কেন অন্যেরা। এ এক আশ্চর্য রহস্য!

জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আচ্ছা সোরান! তুই অমন হয়ে যাস কেন—বলতে পারিস? গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, জাহেরএরাকে ধ্যান করি মনে মনে। জাহেরএরার তো কালীর মতোই শক্তি। বলি, মা তুমি আমার মাথায় চাপো। বাস। তারপর যে কি হয় কি করি—আমি নিজেই জানি না। পুরোহিত এটা শিখিয়েছিল আমায়।

পুরোহিত বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে সত্যি মিথ্যে প্রমাণ করা যেত। অনেকে ওর কথা বিশ্বাস করে, অনেকে আবার করে না। যারা করে না, তাদের যুক্তি— ওর কথা শুনে, ধ্যান ক'রে তারা ওর মত হতে পারেনি মোটে।

এ মানুষের মাথায় যাই চাপুক না চাপুক, এ যদি রঙ্গিয়াকে তার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তার—কি তার দলের সাধ্যি নেই যে, রোখে। এবিষয়ে নিশ্চিন্ত মিশানু।

কিন্তু মিশানু কি করবে এখন?

দেখা করল ফণিভূষণের সঙ্গে। বলল সমস্ত।

মুচকি হেসে সাহস দিল ফণিভূষণ।—আমি তো রয়েছি। কেমন ক'রে রঙ্গিয়াকে নিয়ে যায় একবার দেখছি। নির্ভয়ে থাক। রাতদিন তোর ওখানে আমার লোকেরা পাহারা দিয়ে বেড়াবে। দেখছি, ব্যাটার কত মুরদ! কি করে নাকানিচুবানি খাওয়াতে হয় কাকে এ শর্মা ভালো জানে। ভূতের কাছে মামদোবাজী! 'পীপিলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে।'

আশ্বাস নিয়ে ফিরেছে মিশানু। মিশানু আমির হবেই হবে। রঙ্গিয়াকে ছাড়লে কি আর তা হবে? তার নসিবটা তো নিয়ে নেবে সোরান। ওকেই বিষয়ের মালিক করে দেবে সুরলতা। নায়েববাবু ঠিকই বলেছে। নায়েববাবু তার নসিব।

জেদী মানুষের কেমনতর জিদ—পরীক্ষা করে দেখার জন্য সোরানের কাছে গেছে ফণিভূষণ। সত্যই যদি জিদ এসে থাকে তবে ফণিভূষণের মাহেন্দ্রক্ষণ আসছে বুঝতে হবে। জিদটা আবার থিতিয়ে না যায়—সেদিকেও নজর রাখতে হবে বিশেষ ক'রে। তদারক তদ্বিরে ত্রুটি রাখলে চলবে না।

দালানটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিকানো মাটির দালানে নানা ফুলের আলপনা। সাদা-সবুজ-লাল রঙে রঙিন করে আঁকা নানা ফুল। পদ্ম-জবা আরো কত না। সোরানের মা এঁকেছে। নতুন বৌ আসবে ঘরে। এ কি কম খুশির কথা নাকি। গতকাল সারা দিনটা ধরে এঁকেছে বুড়ি একমনে। কোমর পিঠ আর আস্ত নেই। রাতে কি যাতনা, কি কনকনানি। কনকনানিটা বাড়ল আরো, যখন শুনল, রঙ্গিয়াকে ছাড়ে নি মিশান্নু।

দালানে ঝুঁকে পড়ে আলপনা দেখছে আর বিড় বিড় করে কি বলছে সোরান। নিজে নিজে বলছে, নিজে নিজে শুনছে।

আলপনার ওপর একটা মানুষের ছায়া পড়তেই চমকে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ফণা তুলে একটা সাপ দাঁড়াল যেন লেজে ভর ক'রে!

বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল ফণিভূষণের। তার ওপরই না প্রতিশোধ নিয়ে বসে।

শুকনো গলায় ফণিভূষণ বলল, অন্যায় যা করেছে মিশান্নু, সে অন্যায়ের ক্ষমা-ঘেন্না নেই। আমি তোর সহায়। আমি তো শুনে অবধি তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়েছি। তোর সঙ্গে লাগা—জাত কেউটের সঙ্গে একেবারে। বুঝবে বাছাধন, কত ধানে কত চাল। যার জোরে উদ্ধার করলি ওই কয়েদখানা থেকে রঙ্গিয়াকে, তাকেই কিনা ফাঁকি। যে যেমন কর্ম করবে, সে তেমনি ফল ভোগ করবে। আমার এতে করার কিছু নেই। যা পারিস তোরা কর। জানবি, তোর ভালো চাই আমি। রঙ্গিয়া তোরই

হোক এটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছে। একটা কথা কি জানিস? কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। রঙ্গিয়া তোর ঘরে এলে, তোর দৌলত হলে দম ফেটে মরবে বুড়ো। আরে গাঁয়ের পাতানো কাকা তো। নিজের মেঝ ছেলেটার সঙ্গে রঙ্গিয়ার বিয়ে দেয়ার মতলব করছে নিমকহারাম শয়তান।

দু'চোখে আগুন ছুটল সোরানের। বুক কাঁপানো স্বর।— সত্যি?

—কানা-ঘুষা চলছে। শুনেছি বলেই তো' বলছি।

—না, ওর আর রেহাই নেই। ওর কি করি আমি, দেখবি বাবু তুই। নিজের পাথুরে বুকে পাথুরে হাতের ঘুষি বসিয়ে দিল দুম দুম করে গোটা চারেক।

একতিল দেরী না ক'রে বোঁ বোঁ ক'রে দৌড়ল অন্তরঙ্গদের খবর দিতে। রোদ্দুরে লাল ধুলো উড়ছে, গনগনে লাল আগুন যেন। পাথরের দৈত্যটা পাথর-মাটি গুঁড়িয়ে নিয়ে ছুটছে পুরো গ্রামটার হাড়পাঁজরা গুড়িয়ে নিয়ে বুঝি।

ফণিভূষণ দেখছে আর হাসছে, হাসছে আর দেখছে। কেউ কোথাও নেই। একা একাই হাসছে। চলতে চলতে হাসছে। হাসির ধমকে অঙ্গে অঙ্গে দোলা লাগছে। খুশির দোলা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির খুশি।

অনেক ব্যথা অনেক নির্যাতন তিল তিল ক'রে দগ্ধে মারতে চেয়েছে সুরলতাকে। হার মেনেছে। এবারে কিন্তু সুরলতার হার। নিজের কাছে নিজে হেরেছে।

উঠে দাঁড়াল, পায়চারি করছে।

ঠাকুর ঘরে যখুনি এসেছে, মনটা শান্ত হয়ে গেছে। আজ কিন্তু অশান্ত হয়ে উঠছে। কেবলই মনে হচ্ছে, কার মায়ের বুক থেকে আঁকড়ে ধরা মেয়েকে টেনে তুলে নিয়েছে, কবে।

মনে তো পড়ে না। তবে তার এ দশা হ'ল কেন? তার বুক থেকে রঙ্গিয়াকে কেড়ে নিয়ে গেল কেন ওরা? কি দোষে এ সাজা!

কালী মূর্তিকে জড়িয়ে ধরল পাগলের মতো।—বলতে পারিস, দোষটা কোনখানে? পাথর। প্রাণ কোথা! বুঝবি কি প্রাণের যন্ত্রনা।

মূর্তি ছেড়ে দিয়ে সরে এলো।

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে আছে। নানান প্রশ্ন বিঁধছে বুকের মধ্যি খানটায়। একটার পর একটা। মা-বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে এই বেঁধাবিঁধি আরম্ভ হয়েছে।

বারো বছরে পড়ার মুখে বেঁধাবিঁধিটা হাজারো গুণ বেড়ে উঠল। অপরাধ—পরিপুষ্ট গড়ন। বারোয় বাইশের মতো দেখাত। কাকা-কাকীর কাছে মানুষ। কাকীর দৃষ্টি ঘোরাফেরা করত সর্বক্ষণ সুরলতাকে ঘিরে।

বাপ-মাকে খেয়ে, মেয়েটা গতর বানিয়েছে দেখ না? কাকীমার অস্বস্তির কথা কাকাকে শোনাত প্রায়ই। খাটো করে কথা বলতে জানত না কাকীমা। চুপি চুপি কথাও ঝি-চাকর কেন বারান্দা দিয়ে যে যাবে, তার কানে পৌঁছবে স্পষ্ট।

সুরলতা শুনেছে অনেকবার।

গতর কারো চক্ষুশূল হয়, এটা মাথায় ঢুকত না সে বয়সে। এখন বুঝতে পারে চক্ষুশূলটা কিসের।

বাড়ির অন্য জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভায়েদের—যারা বয়েসে দু'পাঁচ বছরের বড়—তাদের কাছে আসার উপায় নেই। ওপর-নিচে ওঠানামার সময় হঠাৎ কারো সামনাসামনি পড়লে তো রক্ষে নেই! এ ধিঙ্গি মেয়ে আমার হাড়মাস কালি না করে ছাড়বে না দেখছি।

কাকীর গালাগালির চোটে ভূত পালিয়ে যায়। সুরলতা পালাবে কোথায়? তার তো কোন স্থান নেই।

অন্য কাকা-কাকীরা দায়িত্ব নিতে চায় নি। কেননা, বড় তো মেঝদাকে—মেঝবৌদিকে দেখতে বলে গেছে। সুরর ভার ওদের ওপর। সকলে পাশ কাটায়। শুধু পাশ কাটায় না মেঝকাকী। মারুক ধরুক, কাছে টানে এই একটা মাত্র লোক। মেরেও যায়, ফিরেও চায়।

বারান্দায় দাঁড়ালেই, তীব্র ভর্ৎসনা। বলি লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে বসে আছিস নাকি? এমন তো মেয়ে দেখিনি ভূ-ভারতে! একটা কাণ্ড না ক'রে ছাড়বি না দেখছি।

চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেছে ঘরে। মানুষ-প্রমাণ দেয়াল-আয়নার সামনে এনে বলেছে, পোড়ারমুখী নিজের মুখটা দেখ একবার! দেখ, দেখ! নিজেকে ভালো করে দেখ!

নিজের কপাল চাপড়ে, হাউহাউ ক'রে কেঁদেছে কাকী: ওগো বড়দি! আমায় একি বন্ধনে বেঁধে গেলে গো! একি সাজা আমার! আমি যে পাগল হতে বসেছি গো। যম এত মানুষকে নিচ্ছে, আমায় নেয় না কেন?

সুরলতা নিজেকে বিব্রত বোধ করছে। কি করবে পথ খুঁজে পায়নি। কি বলে সান্ত্বনা দেবে, কি করে কাকীমার চোখের জল বন্ধ করবে।

মণিদি এসে ঘরে ঢুকেছে।--আঃ, চুপ কর মা! কি পাগলামো যে করছো, তার ঠিক নেই। বারান্দায় বেরিয়ে খ্যাখো দিকিনি? ও বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে ছেলেরা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সুরকে নিয়ে যদি এত ভয় তোমার, বারান্দায় চিক টাঙানোর ব্যবস্থা কর না। চিক টাঙানোও তো হয়েছিল একসময়! তোমার জন্যেই খুলে ফেলতে হ'ল—বুক গেল, মোটা মানুষ। হাওয়া-বাতাস বন্ধ। দম বন্দ হয়ে আসছে, শীগগির চিক খোলো।

চুপ করেছে কাকী।

রাতে কাকা আসতে আবার হুজ্জত। মেয়েকে কোথাও সরিয়ে দাও, না হয় আমাকে বিদেয় কর! আমি আর সইতে পারছি না। পরের মেয়েকে বোকবো, তাতে অন্য বাড়ীর ছেলের রাগ। মোক্ষদা টিমি কিনতে দোকানে গেছল, শুঁড়ীদের লম্বা ছেলেটার কি ফোঁস-ফোঁসানি। বলে কিনা, তোমার মেঝবৌদিকে সাবধান করে দিও। একটা মা-বাপ মরা বাচ্চা মেয়ের পিছনে দিনরাত লেগে রয়েছে। উঠতে বসতে মারধোর গালাগালি। এসব সহ্য করা অসম্ভব। আহা-হা! কি দরদ রে! কোথা ছিল এতদিন এ দরদী!

কাকা এ সমস্ত নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করেনি। স্বভাবঠাণ্ডা মানুষ। নিজের মেয়ে মণিদির মতো স্নেহ করত! আড়ালে বোঝাত। ওর কথা কিছু ধরিস না। আসলে মানুষটার মন ভালো। মাথার একটু বেঠিক এই যা।

সুরলতা মাথার বেঠিকটা এখন যে দেখছে তা নয়। এখন বরং বাড়াবাড়ি বলা যায়। বছর খানেক আগে থেকেই শুরু। তখন মণিদির বিয়ের সম্বন্ধ করা হচ্ছে।

পাত্রদের কেউ দেখতে এলেই, মণিদির সঙ্গে সে-ঘরে গিয়ে বসত। মণিদিই হাত ধরে নিয়ে যেত। অত লোকের সামনে বৈঠকখানায় একা যেতে খুব লজ্জা করত ওর। মণিদি সুরলতার চেয়ে তিন বছরের বড়।

মণিদিকে খুব সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠানো হত। সে একটা ছোট লাল শাড়ি পরে আসত। এটা মণিদি পরিয়ে দিত। দু'জনে ঘরে ঢুকলে, সকলের চোখ তার মুখে আটকাত। ওদের মধ্যে কেউ কেউ চিবুক ধরে বলত, মা আমার লক্ষ্মী প্রতিমা। আমার ঘরে যাবি মা

ওরা চলে গেলে, খেয়াল হ'ত সুরলতার। মরতে তুই গেছলি কেন? হিত করতে পারবো না বিপরীত করবো—কি দিবি তা বল। কাকীর ঝংকারে কাকা বলেছে, ছেলেমানুষ অত জানে না।

জানে না বললেই তো চলে না। পর্দার আড়াল থেকে দেখলুম কেউই তো ফিরে তাকাল না মণির দিকে। অত ফর্সার পাশে শ্যাম-বর্ণকে কালো মনে হয় না কি? আমি মা, আমারই চোখে কুচকুচে কালো ঠেকছিল, বার বার তিনবার হ'ল। একই কথা। ছোটটি যদি হয়, আশীর্বাদের দিন ধার্য করে যাই এখুনি। সর্বনেশে মেয়ে ঘুরঘুর করে যাবেই। আর মণিটাও হয়েছে তেমনি, নিজের পায়ে নিজে এমন করেও কুড়ুল মারে কেউ!

এরপর ঘরে বসিয়ে রেখে দরজায় পাহারা দিত কাকী।

মণিদিকে পছন্দ করল, যারা দেখল।

কাকীর কি আনন্দ! কাকাকে বলল, দেখলে তো! সবটাতে পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দাও তোমরা আমায়। এবার বুঝলে তো! রাগ কোথায়? এ যে জাতবদ্যি। নাড়ী টিপলে জন্ম-মৃত্যু বলতে পারে?

সুরলতাকে নিয়ে কাকীর জ্বালার অন্ত নেই। এক যায়, আর এক আসে। এবার ভগ্নীপতির চোখের আড়াল করে রাখার জন্য কাকী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। মণিদির বর এলেই খোঁজাখুঁজি করে নাকি হন্যে হয়ে। কোথায় সুর কোথায় সুর। এরকম বেহায়া-নির্লজ্জ জামাইও দেখেনি কখনো কারো কাকী। সবই গ্রহতে করায়। আর যা দুষ্টগ্রহ ঘাড়ে চেপে বসে আছে, তাতে যে সুখ কারো হবে না—এ তো জানা কথা।

জামাই এলেই, সুরলতাকে অপর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হ'ত।

মণিদির মনে সন্দেহের দানা বাঁধল রতিকান্ত জামাইবাবুর রকম-সকমে। মণিদি-সুদ্ধ ভুল বুঝল একদিন। শ্বশুর বাড়ি থেকে এসে হাত দুটো ধরল। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল চোখের জল। বলল, তুই ওকে ছেড়ে দে আমার মুখ চেয়ে। তুই আমার বোন। লোকের কাছে বলতেও লজ্জা। ঘরের কথা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লোকটা স্বপ্ন দেখে কিনা জানি না। তোর নামই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ওর

একবার আধবার নয়, প্রায়ই শুনছি। ঘুমোতে ঘুমোতে ঘুম ভেঙে যায়।

এ-ও শুনল সুরলতা—মণিদির সঙ্গে মনের মিল হচ্ছে না রতিকান্ত জামাইবাবুর। খিটিমিটি লাগছে সামান্য সামান্য ব্যাপারে। বিয়ের একবছর পূর্ণ হ'ল, মন পাওয়া গেল না। কি রুক্ষ মেজাজ! বলেছে, কুমারী বোনটার নাম নাই-বা মুখে আনলে। কেউ শুনে ফেললে, মেয়েটার জীবন যে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা হুঁশ আছে কি? যেই না বলা—একেবারে অগ্নিমূর্তি। তেড়ে এসে বলল, ফের যদি কোনদিন শুনি—তোমায় শেষ করে ফেলবো।

তাকে নিয়ে কেন এমন হচ্ছে, কিছু না বুঝলেও, জামাইবাবু দিদিকে মেরে ফেলবে—এটা ভাবতেও ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠল। চোখের জল বাগ মানল না। মণিদিকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছে সুরলতা। এই মণিদিই যে একমাত্র তার সান্ত্বনা। সকলের বকুনি খেয়ে যখন দিশেহারা, চোখের জল ফেলারও জায়গা খুঁজে পায়নি যখন সুরলতা, তখন এই মণিদিই তাকে টেনে নিয়ে চলে গেছে ছাতের চিলে কোঠায়। বলেছে, বোন, ভালোবাসে বলেই বকাবকি করে রে তোকে সবাই। বলতে বলতে মণিদির গলা ধরে এসেছে। কেঁদে সারা হয়েছে নিজে। সেই মণিদি মরবে তার জন্য।

জিজ্ঞেস করল সুরলতা, তুমিই বলে দাও, আমি কি করবো?

তুই চিঠি লেখ! আমাকে খোঁজাখুজি করবেন না। আমার নাম উচ্চারণ করবেন না। যদি না শোনেন, নিজের মান আর বংশের মর্যাদা রাখার জন্য আত্মহত্যা করতে হবে আমায় বাধ্য হয়ে। আর সেটা আপনারই পাগলামোর জন্য।

কাল হ'ল চিঠি লেখা।

চিঠি হাতে পড়তে ক্ষেপে উঠল জামাইবাবু।—তোমায় বারণ করেছিলুম, সেই কাজ তুমি করেছো। তুমি গিয়ে সব বলেছো, না হলে এ সমস্ত লিখবে কেন সুরলতা? তোমার মুখ দেখবো না আমি

জীবনে। ও আত্মহত্যা করার আগে, তুমি আত্মহত্যা করলে আমি বাঁচি, আমি বাঁচি। পেতনীর হাত থেকে রেহাই পাই।

রেহাই! দারুণ আঘাত লাগল মণিদির।

রেহাই দিল জামাইবাবুকে মণিদি সেই রাতেই। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা আর হেনস্থা থেকে নিজেও রেহাই পেল দশাশ্বমেধের গঙ্গার ঠাণ্ডা বুকে।

এর পর আর বাড়িতে থাকতে পারে নি সুরলতা। শোকে কাতর কাকী ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। অজ্ঞান হয়েছে তাকে দেখলেই। সর্বনাশী রাক্ষুসী, আমার মেয়েটাকেও গিলল। দূর হ, দূর হ! চোখের সামনে থেকে দূর হ!

কাকা আর ভরসা পায় নি বাড়ি রাখতে।

কোন আশ্রমটাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সঙ্গে নিয়ে বেরুল। বাড়িতে কোন কথা কয়নি। রাস্তায় মুখ খুলল। পকেট থেকে রুমাল বার করে দু'চোখ মুছিয়ে দিল। বলল, ছিঃ কাঁদে নাকি? তোর কোন দোষ নেই। তোর কাকীমার—জানিস তো মাথাটা গোলমাল। দু'দিন পর ঠিক হয়ে যাবে'খন। কাশীতে তো আর ভালো আশ্রমের অভাব নেই। ভালো জায়গায়ই রেখে দেবো তোকে। দেখেও যাবো রোজ আমি। কাপড়ের দোকান থেকে ফেরার পথে।

বাপঠাকুর্দার জায়গাজমি থাকা সত্বেও, কাপড়ের ব্যবসাটা কাকার নিজস্ব। দোকানেই থাকে বেশীর ভাগ সময়। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম। এ ব্যবসা নিয়েও অনেক কথা শুনেছে সুরলতা। কাকাই বলেছে। মেয়েটা যাদুও জানে দেখছি। নিজের মেয়ের ওপর টান হোল না, হোল সুরর ওপর। এ বামনীর চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। মেয়েটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সা দেয়া হয় আবার। কর্তার এদিক নেই ওদিক আছে। দোকানটা যা করল, তা দেখছি ওই মেয়েরই জন্য। যা কিছু আয় ওর পেছনেই ঢালছে। নিজের বৌ-

মেয়ে চাইলেই, অমনি—একটা পয়সা নেই তো কাছে। ওই মেয়ে মা নিজের মেয়ে-বৌকে পর করে দিয়ে, নিজেই গ্রাস করে নেয় দোকানপাট সব।

সারাটা দিন ঘুরেছে কাকা তাকে নিয়ে। কখনো টাঙায় কখনো একায়। আশ্রম আর পছন্দ হচ্ছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না সুরলতার। কেবল মনে হচ্ছে, তার জন্যই মণিদি চলে গেল। মুখ দেখে কাকা বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল। বলল, মণি মরে নি। বাবা বিশ্বনাথের ভক্ত ছিল খুব ও। বাবাই কাছে ডেকে নিয়েছে ওকে। ওর জন্য মন খারাপ করিস নি।

হয়তো ভবিতব্য ছিল বলে কাকার মুখ দিয়ে ওই কথা বেরুল। আর বিশ্বনাথকে দেখার প্রবল ইচ্ছে পেয়ে বসল সুরলতাকে। সাহসে ভর করে বলল, কাকু! বিশ্বনাথের ওখানে নিয়ে যাবে?

কাকা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। এতক্ষণ বাদে কথা কইল সুরলতা। বলল, নিশ্চয়, চ!

বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকে খুজেছে মণিদিকে, পায় নি। লক্ষ্য করেছে কাকা। বলল, দিদি তোর বিশ্বনাথের সঙ্গে মিশে গেছে রে। বিশ্বনাথ হয়ে গেছে। দু'চোখে জল ভরে উঠেছে কাকার।

বারো বছর বয়সেও দু'বছরের বুদ্ধি ছিল সুরলতার। মণিদি কিন্তু পনেরোয় পঁচিশের বুদ্ধি ধরত। কথাবার্তাও ছিল পঁচিশের।

বিশ্বনাথকে জড়িয়ে ধরেছে দুহাত দিয়ে। মণিদিরই স্পর্শ পেয়েছে যেন। মণিদি তুমি ঠাকুর হয়ে গেছ। আর কি ফিরে আসবে না আগের মতো? মণিদি যেন বলেছে, নিজের মনে মনেই শুনেছে অবিশ্যি—আমি যে পাথর হয়ে গেছি রে। তোদের মতো আর তো হতে পারবো না।

চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে সুরলতা বিশ্বনাথের সর্বাঙ্গ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এ দৃশ্য একজন। তার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তার ওপর কারো লক্ষ্য ছিল না। কাছে এল, সজল নয়ন

দীর্ঘদেহি পুরুষ, প্রৌঢ়। হাত ধরে তুলল সুরলতাকে। সিল্কের চাদরের খুট দিয়ে মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, কাঁদছো কেন মা?

সুরলতার মনে হ'ল, সত্যিসত্যিই মা-ই এসে বুঝি চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে, আদর করছে। অনেকদিন বাদে একটা স্নেহের অনুভূতি জেগে উঠেছে ভেতরে। এ লোকের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে কত আপনার।

এই অনঙ্গমোহন বাঁড়ুয্যে।

সুরলতার শ্বশুর। কাশী তীর্থ করতে গেছল সপরিবারে। ওখান থেকেই বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো।

আসার সময় বুকে চেপে ধরেছে কাকী। চোখের কোণে জল, তবু মুখে হাসি টেনে বলেছে, সুখী হ'। অনেক কষ্ট পেয়েছিস, অনেক শুনেছিস। তুই আমার মণিরে, তুই আমার মণি। দাঁড়াতে পারে নি কাকী। মুখে মিষ্টি তুলে দিতে হাত থরথর ক'রে উঠেছে। ঘরে ফেরার আগেই পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

কাকীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে কি মণিদিকে? একজন মায়ের বুক থেকে তার আদরের দুলালীকে? তাই কি এই সাজা আজ সুরলতার? তার বলতে রইল না আর দুনিয়ার কেউ। স্বামী গেল, অমন দেবতুল্য শ্বশুর গেল। রঙ্গিয়াকে নিয়ে বুক বেঁধেছিল —সেও গেল।

একি মনে এলো তার?

না, না। রঙ্গিয়া চলে যায় নি। ওদের বোঝাতে গেছে। সে যে বলে গেছে আসবে। তিন সত্যি ক'রে গেছে সে যে। আসবো —নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়।

কেন? এমন হ'য়ে পড়ছে কেন?

সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে সুরলতার। আর ভাবতে পারছে না। তন্দ্রা আসছে। দু'চোখের পাতা বড্ড ভার ভার ঠেকছে। দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না আর।

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছিল, শুয়ে পড়ল মেঝেয়। মনে হচ্ছে রাত হয়েছে অনেক। অনেক—অনেক।

নিশুতি রাত। বাতাস ভারী হয়ে উঠছে ক্রমে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দম আটকে আসছে। একটু জল যদি কেউ দিত মুখে, গলাটা ভিজত অন্তত। ভেতরটা শুকিয়ে মরুভূমি। কি তাপ, কি তাপ! স্বপ্ন দেখছে সুরলতা।

স্বপ্নেই শুনছে, বহু দূর থেকে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান ক'রে করুণ কান্না কার ভেসে আসছে। চেনা গলা। কার? ইয়ো ইঞ্ঞ্ বান্চাও ইঞ্ঞ্মে। ইয়ো আমঠেনিং রুয়োর হিজুয়া।

স্বপ্নেই ছটফট করছে সুরলতা। উঠে বসার চেষ্টা করছে। কান পেতে শুনছে কার কান্না। হঠাৎ ঝনাৎ ক'রে আওয়াজ হ'ল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের কালীর পাথর-হাতের মুঠো খুলে গিয়ে খাঁড়াটা সজোরে পড়ল একদম বুকের ডানদিকটায়। সুর-লতার হৃৎপিণ্ডটা দু' আধখানা হয়ে গেল।

একি স্বপ্ন! ধড়মড় করে উঠে বসল সুরলতা। হাঁপাচ্ছে। দু'চোখ রগড়ে নিয়ে কালীমূর্তীর দিকে তাকাল। যেমন খাঁড়া তেমনি রয়েছে, যেমন হাত তেমনি রয়েছে।

উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সুরলতা।

দূর থেকে ভেসে আসছে একসঙ্গে অনেকের আর্ত কণ্ঠস্বর। আগুন, আগুন। বাঁন্চাও, বাঁন্চাও।

সুরলতা দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে পরিমরি ক'রে ছাদে উঠল। দেখছে। যতদূর চোখ যায়, ততদূর দেখছে। সাঁওতাল পাড়ার দিকে আকাশটা লাল। ওদিক থেকেই আর্তস্বর ভেসে আসছে। খড় পোড়া ঘর পোড়া মানুষ পোড়ার গন্ধ বাতাসে।

ভেঙে পড়ছে সুরলতা টুকরো টুকরো হয়ে। রঙ্গিয়া তো ওইখানেই রয়েছে। স্বপ্নে বোধ হয় রঙ্গিয়ার গলাই শুনেছে। মা! আমাকে বাঁচাও। মা! ফিরে যাবো তোমার কাছে।

রেলিং ধরে ধরে নেমে এলো।

ডেকে পাঠাল সেরেস্তার সকলকে।

ঘুম ভাঙিয়ে তুলল বাড়ীর সকলকে।

এলো সবাই, ফণিভূষণ পর্যন্ত। এলো পাইকরা, এলো দারোয়ান চাকরেরাও।

সুরলতা আদেশ দিল, সাঁওতাল পল্লীর আগুন নেভাতেই হবে যে কোন প্রকারে। রঙ্গিয়াকে বাঁচাতে হবে। নিয়ে আসতে হবে। এখুনি, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়।

আদেশ পালন করতে ছুটল ওরা।

ফণিভূষণও যাচ্ছিল ওদের সঙ্গে। সুরলতা বাধা দিল। তুমি যাবে না। যতক্ষণ না ওরা রঙ্গিয়াকে না নিয়ে ফিরে আসে, ততক্ষণ এই বাড়িতে থাকবে। থাকবে আমার চোখের সুমুখে।

ফণিভূষণ সুরলতার সামনে আজ যেন একটা জড়পদার্থ। সুরলতাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। অত সুন্দর মুখ কি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

সমস্ত শক্তি হরণ করার মন্ত্র সুরলতার গলায়।

—কে আগুন ধরালে?

—আমি কি করে জানবো বৌদি! কথা কাঁপছে ফণিভূষণের।

ধমকের সুরে বলল সুরলতা, সাধু সাজতে চেষ্টা করবে না। যত নষ্টের মূল তুমি—তুমিই।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ফণিভূষণ। বাইরে ম্লান মুখ। আগুন ধরানোর ব্যাপারে যেন সত্যিই সে কিছু জানে না। কিন্তু ভেতরে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ নয়, বড়। আকাশ ছোঁয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। ছুটে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

সোরানের অনুগতরা তারও অনুগত। যেমনটি বলা হয়েছিল, তেমনটি করেছে। তবে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না সম্পূর্ণ। ঠিকে ভুলও তো হয় মানুষের।

ফণিভূষণ বলেছে ওদের, প্রতিশোধ নিতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। দেরী হ'লে মিইয়ে পড়ে সব। আর তাছাড়া অপরপক্ষ ভেবে বসে নিস্তেজ দুর্বল। যে অপমান করেছে সোরানকে মিশানু, সে অপমানের কোন ক্ষমাঘেন্না নেই। ওর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে রাতে।

ওরা জিজ্ঞেস করেছে, রঙ্গিয়াও তো মরবে তা হ'লে।

—মরবে না। না জেনেশুনেই কি আর বলছি! মিশানু খুব সহজ লোক নয়। ওকে বোকা ঠাওরাস নি যেন তোরা। তলায় তলায় খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ও বড় ছেলের ঘরটায় রঙ্গিয়াকে রেখেছে। সেটা তো পাড়ার এক কোণে। আগুন যেতে যেতে ততক্ষণে নিভিয়ে ফেলবে আমার লোকেরা। আর তার আগেই তো তোরা এদিকে আগুন ধরিয়ে ওদিক থেকে রঙ্গিয়াকে নিয়ে চম্পট দিবি।

মোক্ষম যুক্তি। এ যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না মাথাঅলা লোকে, ওরা তো কোন ছাড়। হাঁটুতে দু'হাত ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাল ফণিভূষণকে, প্রণাম জানাল সোরানের অনুগতরা। ফণিভূষণবাবু তো ফণিভূষণবাবুই। জুড়ি মিলবে না। দেবতা। কত না হিতাকাঙ্খী ওদের।

রাতে ফণিভূষণ ঘুমোয় নি। যখনি ঢুল ধরেছে, জল বুলিয়েছে চোখে। নিজেকে সজাগ করে রেখেছে, কানখাড়া ক'রে শুনেছে, আগুন ধরার চিৎকার উঠছে কিনা বাতাসে। যতক্ষণ ওঠে নি, কি দারুণ অস্বস্তি। মনে হচ্ছিল, সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। এত ক'রে মাথা খাটানোর কোন মূল্যই রইল না। কত ক'রে রাগানো হ'ল— ব্যাটারা নির্জীব কোথাকার।

জহুরী জহর চেনে! ঠিক জায়গায় ঘাঁত মেরেছে ফণিভূষণ। ফণিভূষণের চোখ ভুল করে নি। মন ভুল করে নি আজ অবধি।

সাঁওতাল পাড়ায় আগুন লেগেছে।

নিজের বুদ্ধির নিজে তারিফ করেছে ফণিভূষণ। হ্যাঁ, একখানা মাথা বটে, বুদ্ধি বটে। ফণিভূষণ হো হো করে হেসে উঠেছে একা একা।

সামনে ফণিভূষণ মাথা নিচু ক'রে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই থেকে, সে ধারে খেয়াল নেই আর কোন সুরলতার। অস্থির পায়ে পায়চারি করছে দালানের এমোঁড় থেকে ওমোড় অবধি। উৎকণ্ঠা আর অধীর প্রতীক্ষা স্থির হয়ে দাঁড়াতে দিচ্ছে না এক মুহূর্ত। পাগল ক'রে তুলেছে।

যারা এসে দাঁড়াল সাঁওতাল পাড়া থেকে তাদের মুখে শোকের ছায়া। মৌনমুখ প্রত্যেকের।

দাঁড়িয়ে পড়ল সুরলতা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওদের এক একখানা মুখ। চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করল, কপালের রেখার ভাষাও। তারপর নিজেই বলল ক্লান্ত স্বরে, রঙ্গিয়া?

সকলের মুখে কুলুপ এঁটে বসল একেবারে। কেবল এগিয়ে এলো একজন। বুড়ো দারোয়ান গিরিধারী।—মাইজী! আসমান্ চলি গ্যয়ী রঙ্গিয়া।

খানিক চুপ ক'রে গিরিধারীর ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সুরলতা। বিশ্বাস করতে পারছে না। পারছে না ওর কথাকে, পারছে না নিজের কানকে। তাকাল ফণিভূষণের দিকে। একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

কিরকম যেন হয়ে গেল সুরলতা। দু'চোখে জল নেই, শুকনো, খরখরে। কি একটা বলতে চেষ্টা করছে। আটকে আটকে যাচ্ছে। বলল। অন্তর্ভেদী আর্তনাদ। মাঝরাতের বাতাস কেঁদে উঠল, কেঁদে উঠল আকাশ। কেঁদে উঠল গাছগাছালি।—রঙ্গিয়া মরে নি, মরে নি। নিয়ে আয়, নিয়ে আয়....

রঙ্গিয়ার মৃতদেহ এনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল সুরলতার সামনে। পা থেকে বুক অবধি আগুনের রোষে জ্বলেছে মেয়েটা। মুখটা

ঝলসেছে। ঘুমোচ্ছে যেন তবুও। আগুন নেভানোর জলে ভেজা চুলের গোছা চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। সবে মাত্র চান ক'রে উঠেছে যেন। মুখখানাও জলে ভেজা।

সকলেই ভেবেছিল, সুরলতা কেঁদে আছাড়িপিছাড়ি করবে নয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে নয়তো একেবারে উন্মাদ। পরিবেশ যে রকম হয়ে উঠছিল, সুরলতার হাবভাব যেরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, তাতে এটাই মনে করা স্বাভাবিক।

ফণিভূষণ তো স্থির করেই নিয়েছিল তিনটের একটা ঘটবেই। ফণিভূষণ অন্তর দিয়ে চায় না এসব ঘটুক। মিশানুর ঘরে রঙ্গিয়া থাকে না, ওর বড় ছেলের ঘরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, এটা মিথ্যে। এটা বলা হয়েছে, এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্য—দু'পক্ষের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা চরমে তুলে দেয়া আর রঙ্গিয়াকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা।

সব ঠিক হ'ল। সাপকে মারতে শিবকেও লাগল এ যে। বাঁড়ুয্যে বাড়ির মর্যাদা বাঁচুক চেয়েছিল ফণিভূষণ। চেয়েছিল, অনঙ্গমহলে শেকড় গেড়ে বসে শাসন করতে না পারে যেন রঙ্গিয়া কোনদিন ফণিভূষণকে। আর চেয়েছিল, রঙ্গিয়ার ওপর থেকে ফিরে আসুক সুরলতার মন। ফিরে আসুক তার ওপর পুরোপুরি।

এ যা দেখা যাচ্ছে, সুরলতার মন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, স্থবির হয়ে যাবে, মৃত হয়ে যাবে। চোখ ফেটে জল আসছে ফণিভূষণের।

সুরলতা দেখল চেয়ে চেয়ে রঙ্গিয়াকে। পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা! দৃষ্টি বুললো বারচারেক। গিরিধারীর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, হাঁ করে দেখছিস কি তোরা? রঙ্গিয়াকে ঘরে তোলার ব্যবস্থা কর শীগগির! শোবার ঘরে।

অবাক হয়ে গেছে ফণিভূষণ। এটা পাগলের লক্ষণ। অনুশোচনার আগুন জ্বলে উঠেছে ভেতরে দাউদাউ করে। কি ভুল করল—যে ভুল সংশোধনের আর কোন উপায় নেই!

সকলে দেখল হাপুস-নয়নে কাঁদছে ফণিভূষণ রঙ্গিয়ার জন্য! ফণিভূষণবাবুর কি নরম মন, কি দয়ামায়ার শরীর।

দেখল সুরলতাও। হাসল, ঘরে চলে গেল।

শ্বশুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে। হোমের আগুনে আত্মা নাকি আসে, বলেছিল শ্বশুর। তার ক্রিয়াকলাপও লেখা আছে শ্বশুরের হাতে লেখা পুঁথিতে। শ্বশুর নাকি তার গুরুর কাছ থেকে শিখেছিল। নিজে হাতেকলমে করে প্রমাণও পেয়েছে। নিজের ছেলের আত্মাকে আনিয়েছে। স্ত্রীর আত্মাকেও। অর্থাৎ শাশুড়ীর।

স্বামী মারা যাওয়ার পর একলা ঘরে বসে বসে কাঁদছিল সুরলতা। পেছন থেকে পিঠে কে যেন হাত রাখল। চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই শ্বশুরকে দেখল!

শ্বশুর বলল, কাঁদছো কেন? মরে গেলে কি কাঁদতে আছে রে পাগলী? আত্মার মৃত্যু নেই। দেখবি?—আয় ঠাকুর ঘরে।

গিয়েছে। হোমের আগুনে দেখেছে স্বামীকে, এক মুহূর্তের জন্য। বেশীক্ষণ দেখা যায় না কেন জিজ্ঞেস করলে বলেছে শ্বশুর, যাদের আসার ইচ্ছে থাকে, এইভাবে ডাকলে, তারা জন্মালেও আসে। গুরুদেব বলেছেন। যাদের এ দুঃখকষ্টের জগতে রোগ, ভোগ, শোকভোগ করার ইচ্ছে আর না থাকে, তাদের ডাকলে কষ্ট দেয়া হয়। আসতেও কষ্ট তাদের।

রঙ্গিয়া আসবে বলেছে। নিশ্চয় আসবে সে। ঠাকুর ঘরে ঘুমের ঘোরেও শুনেছে ওর কথা। তখন আগুনে পুড়ছিল হয়তো, বাঁচার জন্য ছটফট করছিল। সুরলতাকে ডেকেছিল, সে ডাক স্পষ্ট শুনেছে সুরলতা। ইয়ো ইঞ্ বাঁনচাও ইঞ্চমে····। মা, আমাকে বাঁচাও! তোমার কাছে ফিরে যাবো, ফিরে যাবো।

হোমের আগুনে ডাকবে ওকে সুরলতা। রঙ্গিয়া আসবে। সশরীরে আসবে কোথাও জন্মালেও। ওর বিষয় ওকে বুঝিয়ে দিয়ে মুক্তি পাবে সেদিন সুরলতা।

বিয়ের সমস্ত গয়না পরাল রঙ্গিয়াকে এক এক করে, গলায় হাতে কোমরে পায়ে। মায় মাথায় সোনার মুকুট পর্যন্ত পরাল। ভোরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাগানের মাটি খোঁড়াল। মাটির তলায় শুইয়ে দেয়া হোল রঙ্গিয়ার মৃতদেহ। মৃতদেহের ওপর প্রথম তিনবার মাটি ফেলল সুরলতা নিজে হাতে। রঙ্গিয়াদের পূর্বপুরুষদের প্রথাতেই সমাধি দিল সুরলতা। ওর জ্ঞাতিগুষ্টীরা এই আরজিই করে গেছে শেষ রাতে।

বাগানে এসেছে ফণিভূষণ। সমাধি দেওয়ার সময় সুরলতার মুখের কোন পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ্য করেছে। একটুও না, নির্বিকার মুখ। অদ্ভুত স্ত্রীলোক মনে হয়েছে সুরলতাকে। আরো অদ্ভুত মনে হয়েছে সমাধি দেয়া শেষ হওয়ার পর। হাতের ইশারায় কাছে ডেকেছে ফণিভূষণকে। মৃদু হেসে বলেছে, তোমার খেলা তো সব শেষ হয়ে গেল আজ। এ বাড়ির কাজ থেকেও ছুটি হয়ে গেল।

দিন গেছে, বছর গেছে, যুগও গেছে। একযুগ নয়, দু'যুগের ওপর। জায়গাটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুরনো বাড়ির কঙ্কাল খাড়া হয়ে আছে দু'একটা আশেপাশে। আর আছে অনঙ্গমহলের চারমহল। জরাজীর্ণ ভগ্নদশা। ভেঙে ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। নেই কেউ। আছে শুধু একজন,—সুরলতা।

রঙ্গিয়ার সমাধির জায়গাটা ধসে পড়েছে। কিন্তু পুরো কঙ্কালটাকে যত্ন করে ঘরে এনে রেখেছে সুরলতা। হোমকুণ্ডের সামনে শুইয়ে রেখেছে। আটাত্তর বছরের বৃদ্ধা সুরলতা যেন আটশো বছর বেঁচে রয়েছে রঙ্গিয়ার কঙ্কাল আগলে। সমাধি দেয়ার দিন থেকে যে হোমের আগুন জ্বেলেছে, রেখেছে অনির্বাণ করে এখনো সে আগুন। রঙ্গিয়াকে ডেকেই চলেছে সুরলতা

অনবরত—নিশ্বাসে-প্রশ্বাসেও। সুরলতার জপমালা হয়ে গেছে রঙ্গিয়ার নাম। রঙ্গিয়াকে নাম ধরে ডাকছে, আয় আয় আয়!

কেউ আসেনি, কেউ আসে না। তবু ক্লান্তি নেই। ডেকেই চলেছে সুরলতা। স্থির বিশ্বাস, রঙ্গিয়া আসবেই একদিন না একদিন।

চোখ থেকে হাত নামাল নবীনা।

জলভরা চোখে অসহায় করুণ দৃষ্টি। ঘরটার চারদিকে তাকাচ্ছে। কোথা দিয়ে পালাবে পথ খুঁজছে। মৃত্যু-ত্রাস ছেঁকে ধরেছে সর্বাঙ্গে। কাঁপছে থরথর ক'রে।

আগুনটার তেজ বিশগুণ বেড়ে উঠেছে। লকলক করে এগিয়ে আসছে সহস্র শিখা। চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে পুড়িয়ে মারবে। উঠতে চেষ্টা করল নবীনা। এতক্ষণ পা ছ'টো মেঝেয় আটকে গেছল যেন। উঠল।

এপাশে নবীনা, মধ্যিখানে মাটির হোমকুণ্ডে আগুন জ্বলছে, আগুনের ওদিকে সুরলতা। সুরলতা হাসছে।—আসবি? আয়! এধার দিরে ঘুরে আয়! আয়!

নবীনার মনে হচ্ছে, ঘরটা খোড়ো চালের। ঘরটার চতুর্দিকে আগুন। যেদিকে তাকাচ্ছে, সেদিকেই। কোথা দিয়ে বেরুবে সে? কে বাঁচবে?

দিশেহারার মতো বাঁচার জন্য নবীনা হোমের আগুনের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদিকে কাঁপা শরীর নিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে উঠে দাঁড়িয়েছে সুরলতা। ছ'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকছে। আকুলকণ্ঠে। আয়! আয় রঙ্গিয়া!

মর্মছেঁড়া আর্ত-চিৎকার করে উঠল নবীনা। ইয়ো ইঞ্ বাঁনচাও ইঞ্‌মে! আমঠেনিং রুয়োর হিজুয়া। রুয়োর হিজুয়া।

হতচকিত রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। নবীনাকে বাঁচাতে হবে, আটকাতে হবে। আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে ও যে! কি ভাষায় কথা কয়ে উঠল ও? মুমরুর দিকে ফিরে তাকাল। মুমরুও উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখেমুখে বিস্ময়। এ ভাষা জানে সে। এ তার রক্তমজ্জায় মেশানো যে। নবীনার মুখে সাঁওতালী বুলি বেরুচ্ছে কি করে! মা আমায় বাঁচাও! ফিরে যাবো তোমার কাছে, ফিরে যাবো।

কেঁদে উঠল সুরলতা। বাঁচাও! রঙ্গিয়াকে বাঁচাও। কে কোথায় আছো, রঙ্গিয়াকে বাঁচাও আগুনের হাত থেকে। ও পড়ে যাবে যে এখুনি!

দৌড়ে এসে জাপটে ধরে ফেলল রঞ্জন নবীনাকে। নবীনার মুখ দিয়ে একই কথা বেরুচ্ছে কেবল।—ইয়ো ইঞ্ বাঁনচাও....

যাচ্ছি, যাচ্ছি! দৌড়ে আসতে গিয়ে সুরলতাই পড়ে গেল আগুনের ওপর। সারা দেহ জ্বলে উঠল। কি মর্মন্তুদ দৃশ্য!

আগুনের ভেতর থেকেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে সুরলতা, রঙ্গিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যাও, সরিয়ে নিয়ে যাও!

নবীনা জ্ঞান হারিয়েছে।

সুরলতাকে বাঁচানোর জন্য আগুনের গ্রাস থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করেও পারেনি মুমরু। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত গতিতে। কাছে যাবার সাধ্যি নেই। এগিয়ে আসছে ওদেরও গ্রাস করতে।

রঞ্জন নবীনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। রঞ্জনের চোখে জল। মুমরুরও চোখে জল।

নবীনা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

ওরা তিনজনে দেখছে বাড়িটাকে।

বাড়িটাও জ্বলছে।

নবীনা দেখছে ওই আগুনে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে সুরলতার

স্নেহমমতা মাখানো মুখ। নবীনা শুনছে যেন কাতরস্বরে বলছে স্বরলতা, রঙ্গিয়াকে বাঁচাও, ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

ইয়ো (মা)! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নবীনা। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল রঞ্জন। জ্ঞান হারাল নবীনা আবার।

*　　　　*　　　　*

দেখতে কষ্ট হচ্ছে আমার। তবুও দেখছি।

বাড়িটার নেই আর কিছু। জ্বলেপুড়ে দরজা-জানলা—সব শেষ।

এখন দাড়িয়ে আছে শুধু একটা পাথুরে কঙ্কালের কাঠামো।

॥ দুই ॥

খাদের ধার দিয়ে দিয়ে এলুম আমি।

উইলোগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এখনো।

জায়গাটা এমনিতেই রুক্ষ।

সোহানীয়া লিংটির এই জায়গাটার মতোই রুক্ষ দেখেছিল বলবন্তের মুখ সেদিন।

* * *

লোকটার মুখখানা কি রুক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে দু'চোখে। চরম প্রতিশোধ না নিতে পারলে এ আগুন নিভবে না বুঝি কখনো।

বৃথা বোঝানো। বোঝাতে গেলে—জবাব জিভের আগায় জুগিয়েই আছে—বলছে সঙ্গে সঙ্গে, সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার কোন চেষ্টা করো না আর। এতদিন তোমার কথায় দেখেছি জগৎ, আর নয়। মোহের ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিলে দু'চোখে, সে ঠুলি দু'টো খসে পড়ে গেছে তোমার কার্যকলাপে। তুমি যে কি—সেটা নিজেই ধরা দিলে।

হাসছে সোহানীয়া।

বলবন্তের কথা শুনে, হেসে কুটিকুটি।

ধমকের সুরে বলল বলবন্ত, হাস-তামাশার কথা নয় এ। ক্ষমা তোমায় করা যাবে না, করাও উচিত নয়। যে অপরাধে তুমি অপরাধী, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি, তার দণ্ড কি জানো? কেন তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি—খেয়াল আছে?

কাঁধের বন্দুকটা নামাল। হাত বুলিয়ে নিয়ে কি যেন কি দেখে নিল একবার। তারপর ডান হাতে নিয়ে ছোটার মতো চলতে শুরু করল। বাঁ-হাতের শক্ত মুঠোয় সোহানীয়ার ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরে রয়েছে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো রীতিমতো দৌড়তে হচ্ছে সোহানীয়াকে সমান তালে পাল্লা দিয়ে। যখন পেরে উঠছে না, তখন টলতে টলতে তাল সামলাতে সামলাতে চলছে। নির্দয় হাতের টান নির্দয় মানুষের মন—কোন দয়ামায়া নেই এখানে। অথচ—

অতীতকে টেনে এনে আর কোন লাভ নেই। অতীত ফিরে আসবে না সোহানীয়ার। বর্তমানই চাক্ষুষ প্রমাণ ভবিষ্যতের। ভবিষ্যৎ কি হ'তে চলেছে, সমস্ত জানে। কেন, সোহানীয়া যা জানে, বলবন্ত সিংয়ের কাছেও তো সে বিষয় অবিদিত নয়।

এই-ই হয়। সব জেনে সব বুঝেও সব ভোলে মানুষ। দুঃখ করার, খেদ করার কিছু নেই। সোহানীয়ার একবার মনে হ'ল, হাতে অস্ত্র রয়েছে, গায়ে শক্তি রয়েছে, এ রকম দগ্ধে দগ্ধে মরার কোন মানে হয়?

নিজের ভেতর থেকেই জবাব পেল। যার যে রকম মৃত্যুর প্রয়োজন, সেই রকমই তো হবে তার। মৃত্যুর বিধানে যা লেখা, সে লেখা মুছবে কে? কাটবে কে?

ছোট বড় পাথর-নুড়ি ছড়ানো সারা রাস্তায়। প্রতি পদে পদে হোঁচট। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, গায়ে ছুঁচ বিঁধছে। ধুলোর ঝাপটায় চোখে অন্ধকার দেখছে মাঝে মাঝে।

এ জায়গাটা বড্ড রুক্ষ।

বলবন্তের মুখখানা এখন যেমন রয়েছে, ঠিক সেই রকম। চতুর্দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। রোটাংপাশ দিয়ে বেরুবার মুখে কুলুর শস্য-শ্যামল মাটিতে নিজের প্রাণমন রেখে এসেছে সোহানীয়া। মরেছে তো ওখানেই। এটা তো তার মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া।

সবুজ পশমের ঘাগরা, হাতঅলা জামা আর ওড়না। সব বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ধুলোয়। এখানে বৃষ্টি পড়বে না। তাহলে ধুয়ে যেত। মাথার ওপর মেঘ জমেছে। জমলেও ওই সাদা মেঘ থেকে সাদা তুষার ঝরে পড়বে এখুনি। এ জায়গা এ রাস্তা এখানের আবহাওয়া তার নখদর্পণে। এখান দিয়ে কতবার এসেছে গেছে।

পাহাড়ের মাথায় মাথায় তুষার ঝরতে শুরু করেছে। ঝরে পড়ছে বলবন্তের টুপির ওপর, সোহানীয়ার মাথার ওড়নায়।

চেনা জায়গা আজ অচেনা ঠেকছে। নতুন ক'রে দেখছে যেন। শিবের শ্মশানভূমি একটা। লোকের বসতি নেই। পাণ্ডব বর্জিত। এখানে সে একা। বলবন্ত একা এলেই পারত। এনেছে গোটা আষ্টেক সৈন্য। কেউ পেছনে, কেউ সামনে, কেউ ডাইনে, কেউ বাঁয়ে। সকলেই সশস্ত্র। উদ্ধত।

বলবন্তের নির্দেশে ওরা এসেছে। তাকে অনুসরণ করে চলছে চোখের পাহারা দিয়ে দিয়ে। ওদের বুকে আগুন মাথায় আগুন। তুশমনদের সঙ্গে আঁতাত সোহানীয়ার। তুশমনদের সুবিধে করে দেয়ার জন্য শত্রুপক্ষকেই সবল ক'রে দেখাচ্ছে খালি সকলকে। দেশের লোকের মন ভাঙছে। ভয় ধরছে। লোহার শলা পুড়িয়ে জিভটাকে খতম ক'রে দেওয়া উচিত।

জিভ খতম করতে ওরা আসে নি। ওদের মাথায় ঢুকিয়েছে বলবন্ত। এসেছে বলবন্ত নিজে।

তখন উইলোগাছে ঠেসান দিয়ে বসে সোহানীয়া। গালে হাত দিয়ে ভাবছে। নীল আকাশে দৃষ্টি মেলে ধরেছে। লাল রেশমীর সাজে সেজেছে সেদিন। লাল ঘাগরা লাল জামা লাল ওড়না। বলবন্ত এ রঙটা পছন্দ করে খুব।

বলে, এতে তোমায় নতুন দেখি আমি। যখুনি তুমি লালটা ব্যবহার কর—সে যদি রোজও হয়—তবু আমার পুরনো ঠেকে না। নিত্য নতুন। তোমার লাল পোশাক আমায় পাগল করে তোলে।

—অন্য কোন মেয়েও যদি এ পোষাক পরে সামনে এসে দাঁড়ায় তোমার, তাকে দেখেও নেশা ধরবে নিশ্চয় তোমার? পাগল হয়ে *উঠবে নিশ্চয়?*

—না। সে আমি দেখেছি। তোমাকে সত্যি-সত্যিই বলছি, হয় না। একমাত্র তোমাকে দেখলেই এটা হয় স্রেফ। তোমাকে পেয়েছি অনেক সৌভাগ্যের গুণে। বিয়ে তো এতদিন হয়েই যেত। মিছিমিছি সময় নিচ্ছ কেন জানি না। ভয়ে ভয়ে মরছি আমি দিনরাত।

—সমস্তই তো বলেছি তোমায়। সোহানীয়ার মুখে মৃদু হাসি।

—আঃ, ফের অলক্ষুণে কথা! আমার সামনে আর কোনদিন, কোন সময় এমনতর কথা বলবে না বলছি।

—আমি কি বলি? আমাকে যে বলায়।

—এরকম কথা যদি ফের বল—সত্যি সত্যিই যদি ফলে যায় কোনদিন—তাহলে কি করবো জানো? নিজে হাতে ওকাজটা করার আগে নিজেই, বলে বন্দুকের নলটা বুকের মধ্যিখানে ঠেকিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে বলবন্ত নিজেকে।

সোহানীয়া হাসি চাপতে পারল না। মাথার ওড়না টেনে মুখে গুঁজছে। মানুষটা গোঁয়ার গোবিন্দ। বিদ্রূপ করলে চটে যায় ভীষণ। একটা না অনর্থ করে বসে শেষে।

—হাসি! দেখবে, পারি কি না পারি?

এ লোকের সঙ্গে মিথ্যে বাক্যব্যয় ক'রে কোন লাভ নেই। এর হৃদয়ের আসনে যে একমাত্র সোহানীয়াই বসে আছে সমস্ত জায়গা জুড়ে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সোহানীয়ার আবার ঠাট্টাচ্ছলে কাউকে কেউ আঘাত করুক, সহ্য হয় না একদম; অপরে করুক যে সহ্য করতে পারে না, সে নিজের বেলায়ই বা বরদাস্ত করে কেমন করে?

মানুষটা এসে অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা কাটাকাটি করছে,

হাতপা ছোঁড়াছুড়ি করছে। বসে নি। বসতে বলেও নি সোহানীয়া। নিজে বসেই আছে সেই থেকে। আর বসে বসেই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। জানে ওর নিখাদ ভালোবাসা, তবুও।

উঠে দাঁড়াল।

দেখি! বলে বন্দুকের দিকে হাত বাড়াল সোহানীয়া। বন্দুকটা ছেলেমানুষেরমতো সোহানীয়ার হাতে তুলে দিল বলবন্ত।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল সোহানীয়া, মাথাটা গরম করে দিয়েছি বড্ড। একটু ঘুরে বেড়ানো যাক। চলো ঝর্ণার ধারে।

সে এক দিন গেছে, আর এ একদিন।

এবারে কাছে এসেছে। সে মানুষের মুখ দেখে নি। দুচোখ রক্তবর্ণ। গলার স্বর মোলায়েম নয়। যতখানি কর্কশ হতে হয়, ততখানি। কিম্বা তার চেয়েও বেশী। গলা সপ্তমে চড়িয়ে, আকাশ-মাটি-পাহাড় কাঁপিয়ে বলেছে, এমন বেইমান তুমি তা জানতুম না। পেটে পেটে এত শয়তানি বুদ্ধি!

মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে সোহানীয়া।

মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল বলবন্তের। ভালোমানুষ সাজলে, বোকা সাজলে আর চলবে না। রণজিৎ সিংদের ওখান থেকে কত টাকা পাও? পেয়েছো কত? বীর সিংয়ের বিপক্ষে প্রচার ক'রে আসছিলে এতদিন কেন? বীর সিং যুদ্ধে হারবে, বীর সিং ধরা পড়বে—এ সব রটাতে কেন? বীর সিং ধরা পড়েছে, বন্দীও হয়েছে। তুমি খুশী নিশ্চয়!

—না। মোটেই নয়। এটা হবে বলেই আমি সাবধান করেছি আগে থেকে। আমি জানি, বীর সিং স্বাধীন হতে পারবে না আর কখনো। নুরপুরের দুর্গ উদ্ধার হবে না আর এ জীবনে। দুচোখে হাত চাপা দিয়ে হাপুস নয়নে কেঁদে সারা হয়েছে সোহানীয়া।

চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেছে বলবন্ত। বলেছে, তোমার পোড়া জিভকে জ্বলন্ত শলা দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খতম করে দিচ্ছি।

—তাই দাও।

বলবন্ত থমকেছে একটু! মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে খানিক। তারপর দ্বিগুণ রোষে ফেটে পড়েছে।—তোমার মায়াবী কান্নায় আর ভুলছি না। জবাব দাও। কোথা থেকে, কার কাছ থেকে শুনে শুনে বল তুমি?

—তোমায় তো সবই বলেছি।

—কি সব বলেছি? ও তো মিথ্যে। সত্যি না বললে রেহাই নেই তোমার। দেশের শত্রুকে প্রশ্রয় দেয়া আমার ধর্ম নয় জেনো তুমি বন্দী।

চতুর্দিকে চেয়ে দেখেছে সোহানীয়া। সৈন্যে সৈন্যে ভর্তি হয়ে গেছে! জিজ্ঞাসু দুচোখ তুলে ধরল সোহানীয়া বলবন্তের মুখের ওপর।

—চেয়ে দেখছো কি? আমিই ওদের নিয়ে এসেছি। বিচার হবে তোমার। দণ্ড হবে তোমার। আর সে দণ্ডের সাজা দেবো আমি তোমায় নিজের হাতে। কাউকে বিশ্বাস নেই আমার। তুমি মরেও না মরতে পারো। জল্লাদের কাজ আমি একাই করবো। দেশের পাপকে বীর সিংয়ের কণ্টককে সমূলে ধ্বংস করাটাই মহাপুণ্য।

মহাপুণ্য করতে এসেছে তাই বলবন্ত! বলবন্ত নিজেই তার বুকে গুলি চালাবে দাঁড় করিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে। একটা গুলি চালাবে না। অনেক। যতক্ষণ না বুকের পাঁজড়া ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বলেছে সোহানীয়া।
—বীর সিংয়ের অপমান আমাদের সকলের। সকলের মদত দেয়া উচিত ওকে। আমি এই কথাই প্রচার করেছি প্রতিদিন।

জিজ্ঞেস করেছে বলবন্ত, তা যদি হয়, তাহলে, গোপালমোহনের মৃত্যুদণ্ড হল কেন?

—গোপালমোহন বীর সিংয়ের বিপক্ষে যায় নি! আমিই বলেছিলুম তাকে, বীর সিংকে দেশান্তরী হয়ে থাকতে হবে এবার।

প্রায় বছর দশেক। কাবুলের আমীর শাহ সুজার সঙ্গে নুরপুর দুর্গ উদ্ধারের যে যোগাযোগ করেছেন তিনি, সফল হবে না। ইংরেজরাই তাঁকে সরে যেতে বলবে। রণজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে বীর সিং ষড়যন্ত্র করেছে এটাই রটাবে চতুর্দিকে।

—বিচারের সময় গোপালমোহন তোমার নামগন্ধ করেনি। সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছিল। বরং উল্টোটাই বলেছিল।—আমি মহারাজা বীর সিংয়ের অনুগত। তিনি যাতে বিপদে না পড়েন, তাই নায়কদের কানে তোলার জন্য এসব বলেছি তাঁবুতে বসে বসে।

সত্যিই বীর সিংকে দূরে সরে যেতে হয়েছিল সেবারে। দশটি বছরের জন্য সিমলা পাহাড়ের আরকিতে। এ সমস্ত কি ঘরশত্রু বিভীষণদের নয়?

—বিভীষণ ছিল না সে।

—মিথ্যেবাদী কোথাকার।

নিজের পক্ষ নিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি আর সোহানীয়া।

দু'চোখের জল ঝরেছে কেবল।

ওড়নাকে চার ভাঁজ করে পাকিয়ে দু'চোখ বেঁধে দিয়েছে বলবন্ত। বলেছে, এ কান্নার একটা মোহিনী শক্তি আছে। প্রকৃত দোষী শেষকালে শেকল কেটে না পালিয়ে যায় নানা ছলাকলা করে।

বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে সোহানীয়ার।

একদিন হাত ধরে কথা কইতে কইতে চমকে উঠেছিল সোহানীয়া। মনে হয়েছিল হাতটা ভয়ানক শক্ত। লোহার চেয়েও। এর আগে কিন্তু এমন মনে হয় নি। লোহার আঁকশি একটা। বুকের ভেতর থেকে ওই আঁকশি দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা বার করে দুপায়ে

থেঁতলে থেঁতলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। মিশিয়ে দিল একদম বলবন্ত।

বলবন্ত হাবিলদার। বীর সিংয়ের সৈন্যদের কাছে দেবতার সমান তার সম্মান। বাইরে খুব গম্ভীর, রূঢ় স্বভাবের। কিন্তু ভেতরে একটা শিশু বাস করছে। এ দেখার চোখ আছে বলেই সোহানীয়া নিজেকে সামলে নিল তাড়াতাড়ি। হাসির প্রলেপ মুখে টেনে বলল, কি—অমন করে কি দেখছো অত? আগে কখনো দেখ নি নাকি?

—না, দেখিনি। স্পষ্ট উত্তর বলবন্তের। কি এমন ভাবছিলে—মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল?

—কিছু না, আমার একটা কি ব্যামো আছে—তা আমি নিজেও জানি না। কেন এমন হয়, বলবো কি করে? মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। মনে নানা উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা এসে হাজির হয়। পাগল করে তোলে আমায়। যে সব ছবি আসে, তাড়াতে চেষ্টা করেও পারি না।

মনের কথা বলতে চায়নি সোহানীয়া প্রথমে। কিন্তু নাছোড়বান্দা বলবন্তের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? বলতে বাধ্য হয়েছে।

শুনে, আলতো ভাবে পিঠে থাপ্পর মেরে হো-হো করে জোরে হেসে উঠল বলবন্ত। বলল, পাগলী কোথাকার! তুমি বড় কল্পনাবিলাসী। সূর্য-চন্দ্র মিথ্যে হলেও মিথ্যে হতে পারে। বলবন্তের মন-ভালবাসা মিথ্যে হয়ে যাবে না কখনো জেনো। বলবন্তের হাতে তুমি নিশ্চিন্ত, তুমি নিরাপদ। তুমিই তো বলবন্তের প্রাণ, বলবন্তের শক্তি। তুমি না থাকলে বলবন্তও নেই।

সেদিনকার এই মানুষ বলবন্ত।

সোহানীয়ার জীবন না নিয়ে তৃপ্তি নেই। বলবন্তই একদিন বাঁচিয়েছিল সোহানীয়াকে নিজের জীবন বিপন্ন করে।

পাহাড় ভেঙে ভেঙে জ্বালানি কাঠ আর বরফ নিয়ে পালমপুরের বাজারে আসছিল বেচতে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বলবন্ত। চলতে চলতে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল। কিভাবে যে কাছে এসে ধরে ফেলল, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। মনে হল, হাওয়ায় ভেসে এলো যেন মানুষটা চোখের পলকে। পেছন থেকে ঝাপটে ধরে টেনে নিল।

পপলারের ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসল। তারপর বলল, আজ আর তোমায় বিক্রি করতে যেতে হবে না। আমি কিনে নেব সমস্ত। আজ কেন—রোজই কিনবো। অন্য খদ্দের যোগাড়ের জন্য মরছিলে যে এখুনি। প্রতিদিনই দেখি, এই সড়ক ধরে যাও তুমি। অনেকদিন ভেবেছি, বারণ করবো।

সোহানীয়া হেসেছে! বলেছে, ভয় নেই হাবিলদার সাব। এত সহজে মৃত্যু নেই আমার।

—তুমি জানলে কি করে আমাকে?

—শুনেছি গোপালমোহনের কাছে। দূর থেকে সে দেখিয়েও ছিল।

—গোপালমোহন আমার রোজের খদ্দের। ওকে ছাড়তে পারবো না কিছুতেই, আর তাছাড়া ক'টা দিনই বা—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে সোহানীয়া। দূরের দিকে চেয়ে থেকেছে, আনমনা হয়ে পড়েছে।

—এত ভাবছ কি?

—সে কথা তোমায় বলার নয়। আমি জানি আর জানে গোপালমোহন। চোখের কোণে জলের কণা টলটল করে উঠল সোহানীয়ার।

—ঠিক আছে, তুমি যখন বলতে চাইছ না, আমি জোর জবরদস্তি করতে চাই না। ওকে বেচো।

প্রথম আলাপ এই অবধি। তারপর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে

ছুজনে ছুজনের। কেনাবেচা উপলক্ষ্য ছিল। যে জায়গায় প্রথম আলাপ সেই জায়গাতেই দেখাসাক্ষাৎ চলেছে প্রত্যেক ছুপুরে। ঝড় বৃষ্টিতেও বাদ যায়নি। পাহাড়ের গুহার ভেতর বসে থাকত বলবন্ত, যতক্ষণ না সোহানীয়া এসে হাজির হয়েছে।

এলে, কি যে আনন্দ হত বলবন্তের, সেকথা বলার নয়, অনুভবের। অনুভব করত সোহানীয়া। অনুভব করত বলেই বিষাদের মেঘ ঢেকে দিত সঙ্গে সঙ্গে সুখের সূর্যকে তার।

প্রাণ খুলে মিশতে পারত না। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিজের কাছে নিজেকেই নতুন ঠেকেছে। মনে হয়েছে, সোহানীয়া এ ছুনিয়ায় কারও জন্য আসেনি, আসেনি কেউ সোহানীয়ার জন্যও।

বসতে ইচ্ছে করেনি পাশে। কথা কইতেও না। বৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়েছে গুহার ভেতর থেকে।

বিস্ময় ঝরেছে বলবন্তের কণ্ঠস্বরে। —চলে যাচ্ছো কেন? নিজের বরফ হতে সখ গেছে বুঝি বড্ড? জমে যাবে, জমে যাবে। বাইরে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর তোমাকে। মাথার মধ্যে ঘিলুটিলু আছে, না নেই? বড্ডই জ্বালালে তো!

উঠে এসে ধরে নিয়ে গেছে। জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলেছে, এবার উঠতে চেষ্টা করলেই ঠ্যাং ছুটো আর আস্ত থাকবে না কিন্তু।

এই কথাই বলেছে বলবন্ত, গোপালমোহন যখন ধরা পড়ে। গোপালমোহনকে দেখার জন্য ছটফট করে বেড়িয়েছে সোহনীয়া। সৈন্যদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরেছে। কোথায় আটকে রেখেছে।

সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হেসেছে আর কুৎসিত চোখের ইশারায় সোহানীয়ার সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছে। এমন কটুবাক্য বলেছে যে, কানে শোনা যায় না। কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসে বেঁচেছে।

বলবন্তের লক্ষ্য যে পড়ে নি, ঠিক তা নয়। পড়েছে। সৈন্যরা

এক একজন গোপালমোহন হতে চেয়েছে সোহানীয়ার কাছে। গোপালমোহনকে নাইবা দেখতে পাওয়া গেল। তারা তো রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই গোপালমোহন। এসবও কর্ণগোচর হয়েছে বলবন্তের।

দুপুরে পপলার তলায় দেখা হয়েছে সোহানীয়ার সঙ্গে। বলবন্ত বারণ করেছে সৈন্যদের তাঁবুতে যেতে। —ওখানে ওরকম করে যাও কেন? মানসম্ভ্রম রাখা মুশকিল। সবাই তো আর তোমার গোপালমোহন নয়! দেখি, কি করতে পারি! প্রাণপণ চেষ্টা করবো গোপালমোহনকে বেকসুর খালাস করতে।

বলবন্ত চেষ্টা করেছে। তার সাধ্যের অতীত চেষ্টা। ব্যর্থ হয়ে গেছে। মনমরা হয়ে বলেছে সোহানীয়াকে, পরমায়ু নিশ্চয় নেই আর গোপালমোহনের। বাঁচানো গেল না! রাজদ্রোহী আর গুপ্তচর – দুটোই মোক্ষম।

আর্তনাদ করে উঠেছে সোহানীয়া। দু'টোর ও একটাও নয়। দেবতাতুল্য মানুষটার এই সাজা হয়ে গেল।

যে একদিন গোপালমোহনকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল, সেই মানুষই আবার সোহানীয়া যাতে মৃত্যুদণ্ড থেকে ফাঁক কেটে বেরুতে না পারে কোনপ্রকারে—কোথাও এতটুকু ছিদ্র যাতে না থাকে—বন্ধ করেছে প্রমাণ দিয়ে দিয়ে। গোপালমোহনের ব্যাপারটাও টেনে এনে খাড়া করেছে।

সোহানীয়া গুপ্তচর, সোহানীয়া দেশের শত্রু, জাতির শত্রু।

একবিন্দুও সত্যি আছে কি এর মধ্যে? আছে কি না আছে—ভবিষ্যৎ বলবে। সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রত্যেকেই বলেছে, দোষ ঢাকার জন্য মিথ্যে কাহিনী বলছে বানিয়ে বানিয়ে।

কাঙড়ার কুলুর লাহুলের বাতাস পাহাড় একদিন বলবে—

সোহানীয়া দোষী কি নির্দোষ। একদিন বলবে, সোহানীয়া যা বলে গেছে—সমস্তই সত্যি। একটা অক্ষরেও মিথ্যের ছোঁয়া নেই।

সেদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না সোহানীয়াকে।

সোহানীয়া থাকবে না, আর থাকবে না তার বিচার কর্তারা। কে অনুতপ্ত হবে, কে অন্যায় করার সাজা নিজের মাথায় তুলে নেবে?

নেয়ার কিছু নেই বলবন্তের এক অনুশোচনা ছাড়া! বলবন্তই একমাত্র সাক্ষী, যে সোহানীয়ার মৃত্যুর পর, শেষের কথার প্রমাণ পাবে। সবকিছু আদ্যান্ত মর্মে মর্মে অনুভব করবে।

মৃত্যুর আগে গুটিকতক কথা বলেছে সোহানীয়া বলবন্তকে।

বজ্রগম্ভীর গলায় হেসে উঠেছে বলবন্ত। বলেছে, তোমার কোন জারিজুরি খাটবে না আর আমার ওপর। তৈরী হও। তোমাদের দেবতাকে স্মরণ কর। সময় হয়ে গেছে।

সময় হয়ে গেছে।

রামভকতও এসে বলেছিল একদিন সোহানীয়াকে।—ফিরে চল, আকাশের আলো কমে আসছে। ঠাণ্ডা পড়বে এবার।

টিলার ধারে বসে আছে সোহানীয়া। দূরে দৃষ্টি। মেঘগুলো চরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কে কোথায় গেল না গেল, সে খেয়াল নেই। উদাসীন ভাব। একই মহল্লার ছেলে রামভকত আর গোপালমোহন। দু'জনে বন্ধু। প্রাণের বললেই চলে। একজনের তেষ্টা কমে অপরের গলায় জল ঢাললে।

গোড়ায় গোপালমোহনই দেখেছে সোহানীয়াকে মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময়। একদিন দু'দিন তিনদিন....পরপর কদিনই দেখল একই দৃশ্য। মেয়েটি পা ছড়িয়ে, গালে হাত দিয়ে বসে বসে কি যেন ভাবে। অপলক চোখে কি যেন দেখে। এমনই তন্ময় যে, সামনে দিয়ে বা পাশ দিয়ে লোক চলে গেলেও, কোন হুঁশ নেই।

বিচিত্র মেয়ে। গোপালমোহন সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে পরীক্ষা করে। মনে হয় না রক্ত-মাংসের শরীরের এ মেয়ে। মনে

হয় পাথর কি মাটির। নিশ্বাসটাও পড়ে না বুঝি। হাতপা নড়া তো দূরের কথা।

কোথায় থাকে, কে এ—খোঁজখবর নিতে শুরু করল। খোঁজ পেল। গধেরণে গদ্দিদের মেয়ে। দু'পাশে সার বেঁধে একতলা দোতলা পাথরের বাড়ি। পাথর বলতে এ পাথর নয়। কালো শ্লেটপাথর। ছাদও ওই একই পাথরের। চৌকণা বাড়ি। বাইরে চুনকাম করা।

নৃসিংহের পাঁচটা মেয়ের মধ্যে ও নাকি একটা। তবে পরিচয় বলার সময় মুচকি হেসে, ঠোঁট উল্টে মাথার ওড়নাটা ডান হাত দিয়ে টেনে রেখে, ওড়নার আড়ালেই ঠোঁট মুখ নাড়ছিল প্রতিবেশী বৌ।

সোহানীয়ার কথা বলতে গিয়ে প্রৌঢ়াদের গলায় ব্যঙ্গের সুরই বেশী ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধাদের সহানুভূতি আছে। বলল, মেয়েটার বরাত। এ তল্লাটে অমন রূপ নেই কোন মেয়ের। তবু কি লাঞ্ছনা ভোগ করে। মরা মানুষের চোখের পাতা ভিজে উঠবে। যশোদা অন্য মেয়েদের মারধোর করে না বড় একটা। যত হাত চলে তার ওই মেয়েটার ওপর। ভেড়া চরাতে গিয়ে ফিরতে দেরী কেন? ধিঙ্গী মেয়ে আক্কেলের মাথা খেয়ে বসে আছে একদম। বুদ্ধি আর হবে কবে? মেঘে মেঘে বেলাও তো হয়েছে অনেক। উনিশ পেরিয়ে কুড়ি। বিয়ের বয়েসে পড়েছে। এমন জানলে কে ঘরে নেবে হতচ্ছাড়ীকে। ভোলানাথ এ আপদকে কোত্থেকে জোটালে তার ভাগ্যে। খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে ইচ্ছে করে।

গাছের আড়াল থেকে সোহানীয়ার ছোট বোন রুক্মিণীকে আসতে দেখে গোপালমোহন প্রতি বিকেলে। মেয়েটা মায়ের ধাত পায় নি। মিঠে গলা আরো মিঠে করে বলে, দিদি রে। তোকে নিয়ে আর যে পারি না রে। ওঠ, চল্। একি ব্যারাম বল তো তোর? ভালোও লাগে গালমন্দ খেতে?

চমক ভাঙে সোহানীয়ার। আকাশের তারা মাটিতে খসে পড়ে বুঝি। উঠে দাঁড়ায় শশব্যস্তে। তুই বোনে মিলে, গাছের ডাল ভাঙা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ভেড়াগুলোকে জড়ো করে এক জায়গায়। প্রথমে সোহানীয়া, মধ্যিখানে ভেড়ার দল, পেছনে রুক্মিনী। ঘরমুখো চলে ওরা ভেড়া তাড়িয়ে তাড়িয়ে।

দেখার নেশা ধরেছে গোপালমোহনকে। ও শুধু দেখার জন্যই রোজ ছুটে আসে তুপুরে। নিজের যেটা ভালো লাগে প্রিয়জনকে সেটা না দেখালে পরিপূর্ণ হয় না বুঝি ভালো লাগার।

রামভকতকে ডেকে নিয়ে এলো।

নতুন রকম ঠেকল সোহানীয়াকে রামভকতের। অন্য মেয়ের সঙ্গে অনেক তফাৎ। আকাশে আর পাতালে। দেখে দেখে দেখা জিনিস চোখের তারায় বিরক্তি আনে, মনে অবসাদ। তাই নতুনের আহ্বানে মানুষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে। নতুন চোখের তৃপ্তি মনের তৃপ্তি। নতুনকে অভ্যর্থনা ক'রে নিজের করে নিতে চায়। বলতে ইচ্ছে করে, নতুন, তুমি এই জন্মেই নতুন জন্ম দাও! জন্মান্তর ঘটাও। বলল, মনের গোপন ইচ্ছে গোপালমোহনের কাছে রামভকত। দিলখোলসা মানুষ রামভকত। ভেতর বার সমান।

শুনে, চুপ ক'রে রইল খানিক গোপালমোহন। এটা যে তারও মনের কথা। তখুনি কিছু মন্তব্য করে নি। বলেছে, পরে বলবো। থামনা একটু, দেখ না আর একটু—সঙ্গে সঙ্গে উতলা একেবারে।

রামভকতের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। আর কিছু বলে নি।

দিন চারেক ধরে নিজের মনকে বুঝিয়েছে কেবল গোপালমোহন। বোঝাতে বোঝাতে নাস্তানাবুদ। রামরাবণের যুদ্ধ চলেছে ভেতরে, অহর্নিশি।

যুদ্ধ থামল একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে।

সুন্দরের পূজারী গোপালমোহন। গাছপালা ভালো লাগে, ভালো লাগে পাহাড়—ঝর্ণা—নদী। এ সবেরই একটা অঙ্গ মনে হয় সোহানীয়াকে দেখে। সে চায় এই মাধুর্য এই সৌন্দর্য সকলের নয়নের পিপাসা মেটাক। লোকে দেখুক বিধাতার সৃষ্টি।

মনের কোণে কোন সময় উঁকি মারে নি সোহানীয়াকে ঘরে আনার কথা। নিজের একার ক'রে রাখার কথা। তার মনে সোহানীয়া আনন্দ, তার চোখে সোহানীয়া আলো।

অন্যের চোখে সোহানীয়া যে ভাবে থাকুক না কেন কোন ক্ষতি নেই গোপালমোহনের। গোপালমোহনের কাছে গোপালমোহনের মানসদেবীই হয়ে থাকুক সোহানীয়া দূর থেকেই।

বন্ধুকে বলল, সোহানীয়া তোমার গৃহিনী হ'লে, খুশী হব খুব আমি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল গোপালমোহনকে রামভকত।

এরপর কাছে এগিয়েছে রামভকত। রুক্মিনীর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে। ওপাশের গ্রামের ছেলে তারা। ব্যবসার খাতিরে এই পথ দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। তাই পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য গাছতলায় বসে বিশ্রাম নেয় একটু। ভালো লাগে জায়গাটা। ভালো লাগে ভেড়াগুলোকে চরে বেড়াতে দেখে।

ক্রমে ক্রমে সোহানীয়া আর রুক্মিনীর একেবারে নিজের লোক হয়ে উঠেছে ওরা দুজনে। গোপালমোহন আর রামভকত।

বেলা পড়ার আগে রামভকত রোজ ডাকে।—সোহান! সোহানীয়া, সময় হয়ে গেছে। ওঠো!

একবার ডাকলে সোহানীয়ার তন্ময়তার ঘোর কাটে না। বার তিন চার ডাকলে সজাগ হয়ে ওঠে। সাড়া দেয় আস্তে আস্তে। যেন কত দূর থেকে সাড়া দিচ্ছে! আচ্ছন্নের মতো উঠে দাঁড়ায়।

হাত ধরে নিয়ে চলে রামভকত।

দুচোখ জুড়িয়ে যায় গোপালমোহনের। স্বয়ং রাম-সীতাই চলেছে যেন।

বিয়ে ভেঙে গেল।

দুপক্ষের বাড়ির যখন একমত তখন ব্রহ্মাবিষ্ণু এলেও এ বিয়ে ভাঙতে পারবে না আর। পড়শীরা খুশী। যা:ক্ মেয়েটার এতদিনে তবু একটা হিল্লে হবে। খেয়ে ঘুমিয়ে বাঁচবে। যশোদার দাঁতের বিষের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

নিষ্কৃতি পাবে। মুখে বলা সহজ যত, কাজে তত সহজ নয়। বিয়ে ভেঙে দিল যশোদা নিজেই।

শেষ মুহূর্তে যশোদার ধর্মভাব জেগে উঠল প্রবল। মেয়ে সুখী হবে, এতে কার না আনন্দ হয়। ছেলেদের অবস্থা ভালো। রেশমী পোশাকের কারবার। তিনতলা পাথরের বাড়ি। আর ছেলে তো একটা রাজপুত্তুর। কজন মেয়ের এমন ভাগ্য হয়। বয়েসকালে যশোদা যখন কানে গলায় হাতে গয়না পরে ঠমকে ঠমকে চলত নিজের রূপের গরবে, দেখে কত রসিকতাই না করত বুড়ী ঠাকুমা। বলত—চলে একাকিনী গরবিনী ধনী, দেখে ডাকে কালা বাঁশরীতানে। রূপসী তো সেও ছিল। ডাকসাইটে। বলি, হ'লটা কি? তেমন ঘরে কি পড়েছে?

সে কথা নয়। কথা হচ্ছে, বিছের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে উঠছে যেন যশোদা। গোপন কথা কেমন করে গোপনে রাখে? পেট গুলিয়ে উঠছে। কথা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ দিয়ে। কি অস্বস্তি। না বললে, নিজের বিবেকের কাছে ধর্মের কাছে সাজা পেতে হবে না শেষে! মরণের শেষে নরকগামী হতে হবে যে। স্বামী-পুত্র কেউ এগোবে না সেখানে তুলে আনার জন্য।

অতএব স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করল যশোদা রামভকতের মায়ের কানে

সমস্ত কথা তুলে দিয়ে।—আমাদের গদ্দিরের ভেতর তো বেজাতের মেয়ে আনা নিষেধ। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি। ওর জাত জানি না। মেয়ে বলে মানুষ করেছি, লোকের কাছেও চালিয়েছি। তা বলে বিয়েতে তো আর চালানো যায় না। কর্তার বারণ ছিল। বিবেক বলেছে, এ বারণ না শুনলে কোন পাপ নেই। বরং এতে পুণ্য। সোহানীয়া কুড়নো মেয়ে।

সেটা গ্রীষ্মকাল।

বায়ালাচা পাশ দিয়ে লিংটিতে গেছে যশোদারা। প্রতিবছরই যায় গরম পড়ার মুখে। সেবারে ওখানে পথের ধারে ফুটফুটে সুন্দর একটি বছরখানেকের মেয়েকে শুয়ে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করতে দেখল। মেয়েটা আপন মনেই হাসছে। শূন্যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে কি যেন ধরতে চাইছে।

নৃসিংহের মমতা বেশী। ওই যেন ছেলেমেয়েদের মা। বলল, যেভাবে মেয়েটাকে রেখে দিয়ে গেছে, মেয়েটা গড়াতে আরম্ভ করলে, বেশীক্ষণ আর বেঁচে থাকতে হবে না। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে খাদের অতল তলে তলিয়ে যাবে। যে রেখেছে তার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। নিজে হাতে মারা হ'ল না। অথচ নির্ঘাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হল।

বুকে তুলে নিয়েছে নৃসিংহ।

যশোদা মানা করেছে। ঈশ্বর তো করুণা করেছে। চার চারটে মেয়ে, তিনটে ছেলে—যথেষ্ট। আবার একটা বাড়তি বোঝা তুলে নেয়ার কোন মানে হয়?

তীব্রতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিরক্তিই ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়েছে নৃসিংহের। —তুমি না মা? একথা সাজে না তোমার মুখে।

—মা বলেই তো বলছি—। এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে আর

একটাকে মানুষ করা কষ্টকর। যাদের একদম নেই বা একটা দুটো আছে তারা নিক না! তোমার অত মাথাব্যথা কেন? অনেকেই তো যাওয়া আসা করছে। কারো না কারো নজরে পড়বেই।

কোন যুক্তিই মনে ধরে নি নৃসিংহের। —তার নজরে যখন পড়েছে, তাকেই মানুষ করতে হবে এ মেয়েকে। হয়তো ঈশ্বরের ইঙ্গিত এইটাই।

এরকম হবে, সোহানীয়া আগে থেকেই বলেছে রুক্মিনীর কাছে, বলেছে রামভকতের কাছে, গোপালমোহনের কাছে।

—বিয়ে হবে না।

রামভকত মুখে হাত চাপা দিয়েছে।

ছিঃ! শুভ কাজে ওসব বলতে নেই।

—আমি বলছি, তোমার বাড়ির সকলে সরে দাঁড়াবে। তুমিও।

সরে দাঁড়াল রামভকত নিজেও।

ঘটা ক'রে বিয়ে হয়ে গেল রামভকতের রুক্মিনীর সঙ্গে। যেদিন পণ্ডিত দেখিয়ে ধার্য করা ছিল সোহানীয়ার জন্য—সেই দিনে সেই লগ্নে।

ধর্মবোনের বিয়েতে সোহানীয়া সুখী। নিজের ব্যাপারে নির্বিকার। কোন খেদ নেই, কোন দুঃখ নেই।

সোহানীয়ার ভেতরটা ডুকরে না উঠুক, ডুকরে কেঁদে উঠেছে গোপালমোহনের ভেতর। রামভকত আসলে সোহানীয়াকে চায় নি, তাই পেল না। চাইলে পেত। কোন বাধাই সোহানীয়াকে ছেড়ে রুক্মিনীর বাঁধনে বাঁধা পড়তে দিত না কিছুতেই।

মাঠে এসে বলেছে গোপালমোহন, তোমার এ কষ্টের জন্য দায়ী আমিই। আমিই তোমার সঙ্গে রামভকতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম। ও যে এমন দয়ামায়াহীন, টের পাইনি।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছে সোহানীয়া। —রামভকতের কোন দোষ নেই। আমি নিজেই তো জানতুম কি ঘটবে। দেখতে পেতুম।

এও আবার হয় নাকি ?

গোপালমোহনের মনে হয়েছে, মুখে হেসে উড়িয়ে দিলেও, সোহানীয়া মর্মস্থানে আঘাত পেয়েছে দারুণ। সহ্য করতে পারছে না। মাথাটা বিগড়েছে। আবোল তাবোল বকছে।

বলছে, আমি দেখি নিজেকে। দেখি এক বছর বয়সের আমাকে। দেখি, আমাকে নিয়ে কি বাকবিতণ্ডা না চলছে বাবা মার মধ্যে।

বাবা মাকে বলছে, তোমাকে দূর ক'রে দেব সুভদ্রা। এ মেয়েকে ঘরে রাখবো না কিছুতেই। এ আমার নয়। আমি তো কয়েদী ছিলুম বছর দুয়েক। এ এলো কি করে ?

রোজ এই একই কথা নিয়ে ঝগড়া। বাবার সন্দেহ বন্ধুর মেয়ে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসা-যাওয়া করত বাবা থাকতেই। বাবা বলে তারই মেয়ে।

মা বলে, না। তোমার ধারণা ভুল। ভুল না হ'লে তোমার জায়গার ওপর কে বাড়ি তুলল না তুলল, দেখলে না। লোকের কথা শুনেই ক্ষেপে উঠলে। লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটলে দাঙ্গা করতে। দুপক্ষের সবাই প্রাণে বাঁচলেও রক্ত ঝরল কম নয়। শেষে খুন করতে যাওয়ার অপবাদ মাথায় নিয়ে বন্দী হ'লে, সাজা পেলে।

—সেটার সঙ্গে এটার কি মিল ? খেঁকিয়ে উঠল বাবা।

স্ত্রীর কথা না শুনলেও, কাজ হাঁসিল করতে হবে বাবাকে। মায়ের অজান্তে নিশীথে মেয়ের মুখটা হাত দিয়ে চেপে রেখে, যাতে চিৎকার না করে ওঠে, কেঁদে না ওঠে—মেয়েকে নিয়ে চলল লিংটির পথে।

সকালে মেয়েকে দেখল না। স্বামীকে দেখল না। বুঝল মেয়েটার কপালে অবধারিত মৃত্যু লেখা আছে দেখা যাচ্ছে। তা না হলে নিজের বাপ শত্রু হয়ে দাঁড়ায় !

মা-ও ঘর ছাড়ল।

নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াল। এরকম স্বামীর মুখদর্শন করবে না আর কখনো।

স্বাভাবিক কৌতূহলের জন্য আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাবা সমস্ত। বড় পাথরটার পেছনে শুয়ে পড়ে থেকে উঁকি মেরে মেরে দেখছে।

দেখেছে নৃসিংহকে বুকে তুলে নিতে।

রেগে গেছে নৃসিংহের ওপর। মনে হয়েছে লাফিয়ে গিয়ে মেয়েটার বদলে নৃসিংহেরই টুঁটি গিয়ে টিপে ধরে। মেয়েটা বেশ ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত মরণ-খাদে, সেটা হতে দিল না।

মরা আক্রোশ বুকে নিয়ে ফিরে এসেছে গ্রামে। ঘরে এসে দেখেছে, স্ত্রী নেই। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে—যদিও ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে—গেছে, বাঁচা গেছে। ওরকম স্ত্রী শত জন্মের পাপ। পাপ, পাপ।

স্ত্রীকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে তবু পায়নি। মেয়েকে খুজে পেয়েছে। বড় হওয়ার সঙ্গে বন্ধুর মুখের আদল পেয়েছে কিনা, দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে মধ্যে মধ্যে!

ছুটে ছুটে এসেছে গাধেরণের এই জায়গাটায়। দূর থেকে দেখেছে। এ যে পুরো তার মুখের আদল। বন্ধুর মুখের কোন চিহ্নই নেই। নীরবে কেঁদেছে স্ত্রীর জন্য, কেঁদেছে মেয়ের জন্য। কাছে আসতে সাহস করে নি। এখনো আসে। দূর থেকে দেখে চলে যায় আবার।

একটা করুণ কাহিনী বলে গেল সোহানীয়া।

শুনতে শুনতে চলে গেছে গোপালমোহন কাহিনীর রাজ্যে। শেষ হতে, খানিক পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মনে হল, মায়াস্বপ্ন না সত্যি? এও কি সম্ভব?

জিজ্ঞেস করল, বাবা আসে এখনো। দেখাতে পারো?

—দেখাবো।

দেখিয়েছে সোহানীয়া। যথার্থই সোহানীয়ার মুখ বসানো। স্রেফ বয়সের ছাপ পড়েছে এই যা। কাহিনী বিশ্বাস করেছে গোপাল-

মোহন। তবে সোহানীয়া যে নিজের চোখে দেখেছে, দেখে এসব বসে বসে নিরালায় একলা—এ বিশ্বাস করা যায় কেমন করে?

দ্বিধাদ্বন্দের দোলা দোলে গোপালমোহনের মনে। হয়তো বা বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় গোপনে। কথাবার্তাও হয়। অতীত জানা অসম্ভব নয় ওর মোটেই।

মনের কথা মনেই রেখেছে গোপালমোহন। প্রশ্ন করে আর বিরক্ত করতে চায় নি। অতীতের ব্যথাবেদনা মনে রেখাপাত করা সম্ভব নয় সোহানীয়ার। যে বয়সে ঘটেছে, সে বয়সের অনুভূতি আসে কি এখন? আসে না। এখনকারটাই ঘা দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ওপর। দমাদম হাতুড়ির ঘা। থেঁতো হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। যেমন হাসি হাসি মুখ, তেমনিই রয়েছে। ভেতরের জ্বালা, বাইরে দেখে বোঝার উপায় নেই কোন।

সোহানীয়ার ত্রিসীমানা মাড়ায় না আর রামভকত। আসে গোপালমোহন। আগে আসত একবার করে, এখন সে জায়গায় দু'বার ক'রে। নানা গল্পে ভুলিয়ে রাখতে চায় সোহানীয়াকে।

সোহানীয়া বলে, আমার জন্য ব্যস্ত হও কেন এত? আমি যা তাই আছি। ভাবনাচিন্তার কোন কারণ নেই তোমার। যত ভাবনা আমার তোমার জন্য! আমার জন্য মাথা খারাপ করাটা ঠিক নয়। একটা কাজকর্ম কর।

—কাজকর্মের খবর তো রয়েছেই হাতে? গেলেই হয়।

—হয় যদি, যাও না কেন? যাও! আমার অনুরোধ।

—তোমায় এরকম অবস্থায়—একেবারে একা হয়ে যাবে যে?

—কোন সময়ের জন্য আমি একা নই। আমার কাছে অনেকেই আসে—দূর থেকে – বহু দূর থেকে।

এতদিনের জানাশোনা, কাউকে কোনদিন কাছে আসতে দেখে

নি গোপালমোহন। গোপালমোহনই উপস্থিত একমাত্র সঙ্গী। দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আসে বটে আর একজন। রুক্মিনী শ্বশুরবাড়ি—তার বদলে আসে ছোট ধর্মভাই প্যারেলাল। বেলা চলে গেল, ঘরে যেতে হবে—মনে করিয়ে দিতে আসে।

ওর কাছে আসে অনেকে! পাগল আর কাকে বলে। অদ্ভুত মেয়ে অদ্ভুত কথা। তবু যাই বলুক ও, যাই হোক ও—ওকে ভোলা যায় না রাগ করা যায় না ওর ওপর। বিরক্ত হওয়াও যায় না। ওযে গোপালমোহনের মানস-প্রতিমা। কোথায় যেন একটা যোগ রয়েছে দু'জনের। বোধহয় আত্মায় আত্মায়।

ওর অনুরোধ ওর আদেশ অমান্য করতে ইচ্ছে করে না। পালন করতে পারলে বরং পরমতৃপ্তি আসে ভেতরে।

কাজে লাগল গোপালমোহন। বীরসিংয়ের সৈন্যদলে ঢুকল।

অল্প দিনের মধ্যে দলের সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাজে মন বসছে না। মনটা হু-হু করে ওঠে সর্বক্ষণ। কেবলই মনে হয় ছুটে পালায় গধেরণে। দেখা ক'বে আসে সোহানীয়ার সঙ্গে।

উদাস ভাব দেখে, ক্ষেপানোর সুযোগ পায় সঙ্গীরা। হাসি-মস্করায় মেতে ওঠে সবাই। বলে, ঘরে বুঝি নতুন বৌ? তাই মন টিকছে না নাগরের হেথায়।

কেউ কেউ আবার বলে ওঠে, এবার মরে গোপালমোহনের বউ হব কিন্তু ভাই। যেখানেই থাকুক, আমার জন্য ভাববে অহরহ। আর আমি স্বামী সোহাগিনী হয়ে বসে বসে গাইবো খালি—হায় অহরহ সহি এ বিরহ....।

হেসে ওঠে সকলে। হাসির ধমকে তাঁবুটাও কেঁপে কেঁপে ওঠে যেন।

আর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, থাম দিকিনি তুই। ভারি বুঝেছিস! যত সব হাতুড়ে ডাক্তার। রোগ ধরতে শেখেনি এখনো! আসল ব্যাপারটা কি জানিস? ভয়। স্ত্রী যদি পালায় ঘর ছেড়ে!

সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠল, পালাবে কেন, পালাবে কেন ?

যে বলছিল, সে আবার শুরু করল, বলছি, বলছি। বলার জন্যই তো উঠেছি সরাবের পেয়ালা ছেড়ে। গদ্দিদের মেয়েরা পছন্দ করে না চাকুরে খসমকে। ওরা ছোটবেলা থেকে গান শুনে আসছে, গান গেয়ে আসছে।

টা চাকরা জো না দেনি, চাচুয়া
দেনি, চাচুয়া।
হাক পান্দে উখি গহন্দে হো।

বাবা!

চাকরের হাতে তুমি দিও না সঁপে আমায়।
মালিক ডাকলে, যাবে চলে—
আমি করবো হায় হায়!

আবার হাসি। হাসির চোটে একে অপরের পিঠ চাপড়াতে লাগল। পাশের লোক গোপালমোহনের পিঠে হাত ঠেকাতেই রেগে উঠে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

বাইরে দাঁড়িয়ে হাবিলদার বলবন্ত।

বলবন্ত হাসতে হাসতে বলল—এত হাসি ভেতরে, আর তোমার গোমড়া মুখ কেন? বেরিয়ে এলে কেন?

কেন বেরিয়ে এলো বলেছে। বাড়িতে একবার যাওয়ার জন্য মন ছটফট করছে বড্ড—তাও বলেছে।

বলবন্তের দৌলতে ছুটি পেয়েছে।

এসেছে সোহানীয়ার কাছে।

সোহানীয়া শুনেছে গোপালমোহনের মনের কথা। গম্ভীর হয়ে গেছে। বলেছে, আমি তো মরমর হইনি যে, এত উতলা। এখনো দেরী আছে। রাজার অবস্থা জানো তো। নুরপুর দুর্গ দখল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বীরসিং। এসময় এখান-ওখান করা ঠিক নয়। কখন কি দরকার পড়ে তোমাদের—বলা তো যায় না।

সোহানীয়া বলেছে, আর এসো না। আমি যাবো। দেখা হ'বে তোমার সঙ্গে পালমপুরে রোজ।

আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে গোপালমোহন।—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। অবাক হবার কিছু নেই। সে ব্যবস্থা মনে মনে করে ফেলেছি। প্যারেলালের কাজটা অদল-বদল করে নিলেই হ'ল। ও ভেড়া চরাবে, আমি বরফকাঠ বিক্রি করতে যাবো পালমপুরে। কেমন—হয়েছে তো?

সর্বাঙ্গে হাসির ঢেউ দুলে দুলে উঠেছে গোপালমোহনের। গোপালমোহন দেখেছে একদৃষ্টে। দেখা সোহানীয়া নয়। নতুন। আর একটা নতুন জগতের নতুন সোহানীয়া।

—যাও! আর একদণ্ড দেরী নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করগে।

দৌড়তে দৌড়তে চলে গেছে গোপালমোহন। বাতাস কেটে কেটে দৌড়েছে। সোহানীয়াকেও যেন সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য অনুভূতি।

সোহানীয়া আসে পালমপুরে। বরফ বেচে, কাঠ বেচে। দেখা হয় গোপালমোহনের সঙ্গে। বরফ কেনার ছুতো করে দেখা করে গোপালমোহন।

বরফ খেতে খেতে গল্প করে। রাজ্যের হালচালেরও কথা বলে। মন দিয়ে শোনে সোহানীয়া। শুনতে শুনতে একটা অশুভ আশঙ্কায় দুরদুর করে ওঠে বুকের ভেতর। একথা যে না বললেই নয়। আগে থেকে সতর্ক ক'রে না দিলে সমূহ বিপদ।

বলল চাপা গলায়, গোপালমোহনের কানের কাছে মুখ এনে।—রাজার কানে যাতে পৌছয়, হাবিলদার আর আরো ওপরঅলাদের কানেও যাতে পৌছয়—তোমায় তাই করতে হবে। কথা দাও করবে!

—করবো।

—বীরসিং যেন কাবুলের আমীর শাহসুজার সঙ্গে যোগাযোগ না করে। করলে দশ বছর দেশছাড়া হয়ে থাকতে হবে। শিখ রাজা রণজিৎসিংয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বীরসিং।—এটাই বিশ্বাস ক'রে নেবে ইংরেজ।

—তুমি জানলে কেমন করে?

—সময় অল্প। কাজটা অতি অবশ্য তাড়াতাড়ি করে ফেল। কেমন করে জানলুম, বললেও তো তুমি বিশ্বাস করবে না। যেমন করে ছোটবেলা জেনেছি, তেমনি করেই জানতে পেরেছি এটা। আমি দেখেছি, আমি দেখছি।

তাঁবুতে ফিরে এসে, কম্বল বিছানো তক্তার ওপর শুয়ে পড়েছে গোপালমোহন। কি করা যায়? একটা মন বলছে, একি একটা কথা। বলা উচিত নয়। মুখ বন্ধ রাখা ভালো। আর একটা মন বলছে, সোহানীয়ার কথা সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক—সে জমা-খরচে প্রয়োজন নেই। তবে বললে দোষ কি? সাবধানের মার নেই। দু'টো পাল্লার শেষেরটাই ভারী হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে, ঝুলে পড়ছে।

গোপালমোহনের কানে কানে কে যেন এক নাগাড়ে বলে চলেছে, বল, বল। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের কানে কানে বলে আয়। এখুনি। একটা কাণ্ড ঘটে যেতে আর কতক্ষণ।

সম্মোহিতের মতো বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। সকলকেই ডেকে ডেকে বলল। কথা ছড়াল বাতাসে। কথাটার গুরুত্ব দেয় নি অত কেউ প্রথমে। ভেবেছে শত্রুপক্ষের রটনা। ভয় দেখিয়ে স্নায়ু অবশ ক'রে রাখা। বিপক্ষ ভয় পেয়েছে বলেই ভয়ের কথা রটাচ্ছে।

সত্যি সত্যিই যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল সোহানীয়ার কথা, তখন টনক নড়ল সবার। ওপরতলার, নিচের তলার। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। দেশের ভেতর গুপ্তচর। খুঁজে বার কর।

তলোয়ারের ঘায়ে ঘায়ে টুকরো টুকরো করে ফেল। যেটা হ'ল সাবধান করার নামে আগে থেকেই প্রচার করে লোকের মনোবল ভেঙে তছনছ করে দিতে চেষ্টা করেছে চর। কোন ক্ষমা নয় কোন মায়া নয় কোন দয়া নয়।

প্রচারের উৎপত্তি কোথা থেকে? করল কে প্রথমে?

গোপালমোহন!

বন্দী হয়েছে গোপালমোহন।

উৎপীড়ন-নির্যাতনে সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, তবু সোহানীয়ার নাম প্রকাশ করেনি গোপালমোহন। কার কাছ থেকে একথা জানতে পারলে তুমি? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়েছে,

—কারো কাছ থেকে নয়।

—তবে কি আসমান থেকে শুনলে?

—না, আমার মনে হয়েছে এমনি।

—এমনি?

সপাং সপাং চাবুক পড়েছে গোপালমোহনের পিঠে—সর্বাঙ্গে। মারতে মারতে নায়ক রাগে কেঁপেছে ঠকঠক করে। কথা না বার করতে পারার আক্রোশ মিটিয়েছে দেহের ছাল চামড়া তুলে দিয়ে, রক্তারক্তি করে।

বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল গোপালমোহনের।

শেষ দেখা করার চেষ্টা করেও দেখা করতে পারে নি সোহানীয়া। মৃতদেহটাকেও দেখতে পায়নি। কান্নায় ভেঙে পড়েছে। একি দেখল সে? একি বলল গোপালমোহনকে। তরতাজা একটা শিশুসরল মনের জোয়ান সরে গেল পৃথিবী থেকে—স্রেফ তারই কথার জন্য।

আর কাছাকাছি আসতে দেয় না কাউকে সোহানীয়া। বলবন্তকেও।

বলবন্ত বলেছে, আমাকে নিয়ে তোমার ভয় নেই কোন। আমি বলছি তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো। দূরে দূরে সরে থাকলে মনে হয়, তোমাকে যেন হারিয়ে ফেলছি আমি।

—সেটা বরং ভালো। অন্যটা হওয়া যে চাই না আমি। রামভকত এসেছিল, সে দূরে চলে গিয়ে তবু বেঁচেছে। কিন্তু গোপালমোহন? ওর কথা ভাবতেও পারা যায় না।

—আমার বেলায় স্বতন্ত্র। দেখবে কিচ্ছু হবে না আমার। বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

সোহানীয়া হেসেছে। নিশ্চিন্ত বা অস্থির হওয়া কি আর হাতের মুঠোয়? এরা বোঝে না কেন? নিশ্চিন্ত হতে চাইলেও পারে না। আবার নিশ্চিন্ত হবে না মনে করলে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। তার মন তার নয়। নেপথ্য থেকে ঘটনার সুতো বেঁধে, কে যেন মনকে ঘোরায় ফেরায়। সোহানীয়ার মনের কথা শোনার কেউ নেই। বলার যে অনেক কিছু ছিল তার।

বলবন্তের কাছে লুকোয় নি। তাকে দেখে, প্রথমে তেমন কিছু মনের কোণে উঁকি মারে নি। কিন্তু মিশতে মিশতে—এ আবার অন্য দৃশ্য। হ্যা, স্বতন্ত্রই। এটা অবিশ্যি নিজের, অন্যের নয়। নিজের হলেও এই লোককে কেন্দ্র করে। এর মন থেকে সরে যাবে সোহানীয়া। দৃষ্টি থেকেও। এর হাতেই তার—

বলেছে বলবন্তকে। হাতে হাত রেখে কথা কইতে কইতে দেখেছিল। মুখের পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছিল, তা না হলে অমন করে ধরে পড়ল কেন সোহানীয়াকে বলবন্ত কি হয়েছে বলার জন্য।

শুনে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সোহানীয়া কল্পনা-বিলাসী, যত সব মিথ্যে ভয়। মিথ্যে ভয় ফলেছে। বলবন্তই তাকে সন্দেহ

করেছে! আটকেছে। বিচারে তার বিপক্ষে সওয়াল করেছে। সে থাকবে না, দুঃখ নেই। দুঃখ বীরসিংয়ের জন্য। তার কথা শুনে হুঁশিয়ার করল না কেউ ওঁকে।

রণজিৎ সিংয়ের কবল থেকে নূরপুর দুর্গ উদ্ধার করতে গিয়ে হেরে যাবেন বীরসিং—কানে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে সে বলেছে বলবন্তকে। বলেছে, শুধু হেরেই যাবেন না উনি, পালাতে হবে ওঁকে আবার। চম্বারাজ্যে। চম্বারাজ কিন্তু ধরিয়ে দেবেন। রণজিৎ সিংয়ের হাতে বন্দী হবেন।

দু'হাত ধরে জলভরা চোখে অনুনয় করেছে সোহানীয়া বলবন্তকে। এ বিপদ থেকে রাজাকে রক্ষে করার চেষ্টা কর তুমি। রাজাকে যুদ্ধ করতে যেতে দিও না। চম্বা রাজ্যের ধারে কাছে যেতেও না। শীগগির ব্যবস্থা কর। এ যুদ্ধ বন্ধ কর। রাজাকে আটকাও।

অস্থির পায়ে পাগলের মতো পায়চারি করছে সোহানীয়া।

হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি দুচোখ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল বলবন্তের। দেখছে, এত দিন অন্ধের মতো দেখেছে। কে এ? কার সঙ্গে মেলামেশা করেছে প্রাণ খুলে! যুদ্ধ বন্ধ কর, রাজাকে আটকাও! একি কোন দেশের লোকের কথা! রাজা যুদ্ধ করবে না। শত্রুপক্ষের জয়জয়কার হয়ে যাক নিমেষে। ভালো মতলব!

যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি একে নজরবন্দী করে রাখতে হবে। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, গোপালমোহনকে এই-ই হাতিয়ার করে, লোকের স্বাধীনতা লাভের উদ্যমটাকে ঝিমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে।

দীর্ঘকাল ধরে তার চোখে মোহজাল বিস্তার করে রেখেছে। নিজেকে জানতে দেয় নি সোহানীয়া। দুঁদে হাবিলদার বলবন্তকে ভেড়া বানিয়ে চরিয়ে বেড়িয়েছে। ওর সঙ্গে মিলেমিশে যে ভুল করেছে, প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। নিজে হাতে ওর মৃত্যু এনে দিতে পারলেই তবে প্রায়শ্চিত্ত। তবে শান্তি, তবে আনন্দ।

দেশের শত্রুকে নিপাত দেওয়াই বলবন্তের শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ পুণ্য।

বন্দী করার সময় সোহানীয়া অবাক হয়েছে।—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। আমার চোখে আর ধুলো দেয়ার কোনো উপায় নেই তোমার। মুখ খুলে বলেনি আর এবার সোহানীয়া। মনে মনে বলেছে, শোনার কেউ নেই। রাজার দুরবস্থা করবে এরাই। অবধারিত যন্ত্রণা এগিয়ে আসছে।

সোহানীয়ার দুচোখ উপচে জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে।

বলবন্তের অট্টহাসিতে পাহাড় গুহা গাছগাছালি কেঁপে উঠল। ঝরণার জলতরঙ্গ বাজনাটা থেমে গেল সহসা। সোহানীয়া চমকে উঠল। প্রতিধ্বনি শুনছে, কি বলবন্তের আসল গলা শুনছে, বুঝতে পারছে না। একসঙ্গে অনেক বলবন্ত বলছে যেন। মায়া কান্না, মায়াকান্না। এ কান্নায় আর ভোলাতে পারছ না এ বান্দাকে। এবার তোমার খেলা সাঙ্গ হল।

কয়েদখানায় সোহানীয়ার কাছে এসেছে অনেকে। খড়ের গাদায় শুয়ে শুয়েই ওদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। উঠবে কেমন করে? পা বাঁধা, পিছমোড়া করে হাত বাঁধা। হাবিলদারের সমশ্রেণীর লোকেরা এসেছে। এসেছে ওদের ওপরঅলারাও। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে। কে চরগিরি করতে পাঠিয়েছে, মনোমত জবাব না পেয়ে ও চর নয় শুনে বিরক্তির একশেষ সকলে। সোহানীয়াকে তড়িঘড়ি যম-সদনে পাঠানোর ব্যবস্থায় লেগে পড়েছে।

যুদ্ধে হারলেন বীরসিং। পালালেনও চম্বারাজ্যে। রণজিৎ সিংয়ের হাতে বন্দী করালেন চম্বারাজ। অমৃতসর গোবিন্দগড় দুর্গে বন্দী হয়ে রইলেন তিনি।

সোহানীয়ার কথা মিলেছে। গুপ্তচরগিরির এটা মস্ত প্রমাণ। প্রমাণ পেয়ে কি হৈ-চৈ সোহানীয়াকে নিয়ে। কড়া পাহারা রাখা হয়েছে কয়েদখানার চতুর্দিক ঘিরে। চর না পালিয়ে যেতে পারে

অসতর্ক মুহূর্তে। ওর পেছনে প্রবল শত্রুর করুণা রয়েছে। সুবিধে পেলেই নিয়ে উধাও হবে।

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়ে গেছে। তবু কয়েদখানায় বেশ কিছু দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে সোহানীয়াকে। পুরনো হলে নিজের অজ্ঞাতসারেও সোহানীয়া যদি শত্রুর কোন দুর্বল মর্মস্থানের কথা বলে ফেলে তাহলে বীরসিংয়ের সৌভাগ্য ফিরলেও ফিরতে পারে। বিজয়-লক্ষ্মী সদয় হতে পারেন আবার। বীরসিংয়ের শাসনে নুরপুর দুর্গ অতীত গৌরব ফিরে পেতে পারে আবার।

কিন্তু ব্যর্থ সব। সোহনীয়াকে উৎপীড়ন করে, যত্ন করে—কোন কিছুতেই কোন ফল হল না। কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না।

পাথরের ঘরটা একটা অন্ধকূপ। কোনদিক দিয়ে আলো বাতাস আসার উপায় নেই। পশ্চিমদিকে ছাতের কাছ বরাবর একটা মাত্র যা আওয়াজি রয়েছে। একটু আলো আসে ওখান দিয়ে, একটু বাতাসও আসে।

শুয়ে থাকলেও ওই আওয়াজিটার দিকে চেয়ে থাকে, বসে থাকলেও চেয়ে থাকে। তার দেহের ওপর দিয়ে মনের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটা গেল, যাচ্ছে—কোন আঘাত লাগে নি, লাগছেও না। ওইটুকু আলো ওই টুকু বাতাস অনেক আলো দিচ্ছে তাকে, অনেক প্রাণ দিচ্ছে।

জন্মাষ্টমীর গানবাজনা চলছে বাইরে। সৈন্যদের তাঁবুতে তাঁবুতে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। আওয়াজি দিয়ে আলো আসছে না, বাতাস আসছে কেবল। খুশিতে মনটা ভরে উঠছে। ঢোলকের বোলের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গান ভেসে আসছে কানে। সৈন্যরা গাইছে গলায় গলা মিলিয়ে।

....

ভাদুরু মাহিনে
নেহরি রাতি হাঁ।

আন্ধি দাইয়া
লোজন হোই ;
প্যাহারী ও যে
নিদ্রা যে আই হাঁ।

অর্থাৎ,

ভাদরের অন্ধকারে
রজনীর কোলে—
বল কে তুমি এলে ?
তোমাদের নয়নমণি
প্রাণের কানাই।
দিশেহারা অন্ধদাই
দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে,
আনন্দে দেখে চেয়ে
প্রহরী কাতর ঘুমঘোরে।

ছোট বেলায় শুনত। পড়শীর মেয়েরা গাইত ঢোলক বাজিয়ে। সাত-আট বছর বয়স। যে কোন গান একবার শুনলেই গলায় সুর বসে যেত। গানের কথা বুকে বাসা বাঁধত। বুক ঠেলে গলা ঠেলে সুর আঁকড়ে বেরিয়ে আসত ঠোঁটের বাইরে। গাইত দু'চোখ বুজে। মুগ্ধ বিস্মিত পড়শীরা। এমন প্রাণ-মাতানো মিহিগলা নাকি ও তল্লাটে কোন মেয়ের নেই।

গানের একটা কলিই গাইতে তার ভালো লাগত বেশি করে। আন্ধি দাইয়া লোজন হোই। অন্ধ দাইয়ের আঁখি, ফিরে পেল দেখার আঁখি। এত ভালো লাগত, দিন রাত গাইত ঘুরে ফিরে। পথে ঘাটে মাঠে শোয়ার বিছানায়। মনে মনে চিন্তা করত, অন্ধদাই চোখ পেল, কৃষ্ণ দেখল। চোখ থেকে সে দেখছে না কেন কৃষ্ণকে ?

জিজ্ঞেস করল পুরোহিতকে। এ প্রশ্ন করেনি কখনও কোন লোক। না পুরুষ না স্ত্রীলোক। ছেলেমেয়েরা তো দূরের কথা।

পুরোহিত বললেন, কৃষ্ণ পূজো সেরে, এর আসল মানে বোঝাবো। কিন্তু এত কম বয়সে সে মানে বুঝবে কি ক'রে? বড়দেরই বোঝা দুষ্কর।

বুড়ো মানুষের মতো ঘাড় নেড়ে বলল সোহানিয়া, ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। বুঝবো।

চেয়ে চেয়ে দেখেছেন পুরোহিত। এতটুকু মেয়ে—এত বড় প্রশ্ন।

পুরোহিত ভেবেছিলেন ছেলেমানুষী খেয়াল এটা স্রেফ। পূজো শেষ হ'তে হ'তে ভুলে যাবে, নয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ঠাকুর ঘরের দোর আগলে, জেগে বসে আছে ঠিক সোহানীয়া। পুরোহিত মনে করেছিলেন বাচ্চাকে একটা যা হয় বুঝিয়ে দেবে'খন। কিন্তু ভেতরে বিবেকের চাবুক খেলেন। যা প্রকৃত মানে তাই বলবেন। বুঝুক আর না বুঝুক। তাই বলে ঠকাবে একটা সরল শিশুকে? ওরাই তো দেবতার প্রতিমূর্তি।

বলেছেন পুরোহিত, আমরা সকলেই অন্ধ। চোখ থেকে অন্ধ। তাই দেখতে পাই না। এই চোখেই দেখতে পাওয়া যায় কৃষ্ণকে—কৃষ্ণের লীলার সমস্ত কিছু। অবিশ্যি এই চোখেই সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হয়। সে বড় কষ্ট। সবাই পারে না। দু'দিন করে ছেড়ে দেয়।

—বলুন না কি? আমি পারবো। আমি ছাড়বো না। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

—পারলে, ইচ্ছে থাকলে, সব কষ্টই সহজ। ধৈর্য ধরে মনে মনে ভাবতে হবে কেবল—

—প্রকৃত দেখার চোখ আমি জন্ম থেকেই পেয়ে এসেছি। আমি প্রকৃত বস্তু দেখতে পাবো। দেখবো দেখবো—নিশ্চয়ই দেখবো।

এই ধ্যানজ্ঞান করেছে সোহানীয়া বরাবর। এক দিনের জন্য ফাঁক নেই। এখনো এই চিন্তাতেই ডুবে থাকে সে। চিন্তার মধ্যে দিয়েই ভেসে ওঠে নানা ছবি। তার নিজের, বীরসিংয়ের, বলবন্তের।

বাইরের গান শুনে চলছে এবার। শেষ হয়ে আসছে। ভোরের ফিকে আলো আওয়াজিতে উঁকি মারছে। গান গাইছে সৈন্যরা।

....আম্ভি দাইয়া লোজন হোই। সোহানীয়াও গুনগুন ক'রে গাইছে।

উইলো গাছের সঙ্গে দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে সোহানীয়াকে বাঁধল বলবন্ত। পাছে পালিয়ে যায়। আটজন সৈন্য ঘিরে রয়েছে, তবু ভয়। গাছটার পাশ দিয়ে বিরাট খাদ নেমে গেছে। লিংটির এ জায়গাটা অনেক চেনা মনে হচ্ছে সোহানীয়ার। মনে পড়েছে। আবার দেখছে, বলবন্ত চোখ বেঁধে দিয়েছে আগে। চোখ বাঁধা অবস্থাতেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। দেখছে মনের চোখে।

ছোট সোহানীয়া। এক বছরের। হাত পা নেড়ে খেলা করছে। হাসছে। সোহানীয়ার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

হঠাৎ মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। আকুতির সুরে বলে উঠল সোহানীয়া বলবন্তকে।—শীগগির যাও! বীরসিংকে বাঁচাও। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নুরপুর দুর্গের কাছাকাছি যুদ্ধ চলছে। মহারাজের মরণপণ—হয় দুর্গ জয়, নয় মৃত্যু বরণ। চম্বারাজ অনেক —অনেক টাকা দিয়েছে রণজিৎসিংকে। ছাড়িয়ে এনেছে বীরসিংকে। সামান্য একটা মেয়ে মানুষকে নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ কেন এত? একটা বড় মাথা যে চলে যেতে বসেছে!

সৈন্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একথা শোনার পর কি করবে তারা? সম্মোহিতের মত শুনছিল বলবন্ত। সৈন্যরা কাছে এগিয়ে আসতে সম্বিত ফিরে পেল। চিৎকার করে বলে উঠল, মায়াবিনীর কোন কথায় তোমরা কান দেবে না। এটা একটা পালানোর ফন্দি ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা তৈরী হও। এই

গাছটার দিকে নজর রেখে, আমার বন্দুক চালানোর সঙ্গে তোমরাও সবাই বন্দুক চালাবে।

সোহানীয়া আর্তনাদ করে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও বীরসিংকে। বুকে বিঁধেছে গুলি। দুর্গের দেয়ালে মাথা ঠুকে পড়ে গেলেন নীচে। কি রক্ত, কি রক্ত!

সোহানীয়ার মনে হচ্ছে, কে যেন ডাকছে তাকে। কাছে এলো। যত্ন করে আগলে আগলে নিয়ে যাচ্ছে। সোহানীয়া চলে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে।

বজ্রকণ্ঠস্বর বলবন্তের—শয়তানীকে আর এক মুহূর্ত বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়! শেষে মাথা বিগড়ে দেবে সকলের। চালাও—

বলবন্তের মুখের কথা খসতে না খসতে আদেশ পালন করল সৈন্যরা। চতুর্দিক থেকে গুলি ছুটে এল। সোহানীয়ার সারা শরীরে রক্তের বন্যা ব'য়ে গেল। মাথা লুটিয়ে পড়ল।

পৈশাচিক উল্লাসে হেসে উঠেছে বলবন্ত। হাসিতে যোগ দিয়েছে অনুগত প্রভুভক্ত সৈন্যরাও।

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যতদিন ক্ষমতা ছিল চলা-ফেরার, লিংটির এই জায়গাটায় বলবন্ত। এই উইলো গাছটার তলায় বসে থেকেছে। যাওয়ার সময় গাছটার গুলি বেঁধার জায়গায় জায়গায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চোখের জল ফেলেছে আর বলেছে, সোহানীয়া! তোমার কথা শুনে তখুনি চলে গেলুম না কেন? গেলে বীরসিংকে বাঁচানো যেতে পারত হয়ত।

* * *

উইলো গাছটায় বুলেট বেঁধার দাগ স্পষ্ট।

আকাশে সাদাটে মেঘ। মেঘ থেকে সাদা তুষার ঝরে পড়ছে গাছের ওপর।

আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে যাচ্ছি, মনে হল, বলবন্ত যেন হাত বুলোচ্ছে গাছের গায়ে।

সরে এলুম আমি।

ও গাছ ছোঁয়ার অধিকার আমার নেই। সোহানীয়ার পবিত্র দেহের স্পর্শ লেগে রয়েছে ওই গাছে।

॥ তিন ॥

ভুবন পাহাড়ের এই গুহাটার ভেতরই প্রমীলা রত্নেশ্বরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। প্রমীলার হু'চোখের দৃষ্টি ওকে নিষ্ক্রিয় জড়পদার্থের মতো করে তুলেছিল।

রত্নেশ্বর গুহার ভেতর থেকে না পেরেছে বেরোতে, না পেরেছে আরো ভেতর দিকে যেতে।

ভেতরের বাতাস বেশ ভারী। আমার দম আটকে আসছে। এগোনো যায় না এমন অন্ধকার।

রত্নেশ্বরের মতো আমারো মনে হচ্ছে, গুহার ভেতরটা কাঁপছে।

*　　　*　　　*

গুহার ভেতরটা কাঁপছে একটু একটু করে। মিশমিশে কালো অন্ধকার এগিয়ে আসছে। ঝাঁপিয়ে পড়বে রত্নেশ্বরের ওপর। অমন শক্তসমর্থ লোকটা একটা অজানা ত্রাসে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যাচ্ছে।

যাকে ভেবেছিল এতদিন একটা খেলার পুতুল, সেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে দেখতে দেখতে। সাক্ষাৎ একটা মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না ওকে। কোনটা এর আসল রূপ—আগে যেটা দেখেছে, না এখন যেটা দেখছে? বুদ্ধি দৃষ্টি বিমূঢ় বিভ্রান্ত।

হু'জন ছাড়া আর কেউ নেই ভেতরে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে হুজনে। নিষ্পলকে তাকিয়ে রয়েছে একজনে একজনের দিকে। টুকরো টুকরো রোষ ঠিকরে পড়ছে একজনের হু'চোখ দিয়ে। মাথার রক্ত নামছে চোখে মুখে।

পাটিপেড়ে বসে বলতে গেলে পস্তাতে হবে। শেষে হয়তো গিয়ে দেখবো—খেল খতম পয়সা হজম।

হেঁয়ালিটেয়ালি ওসব বুঝি না। বেঁকাটেরা কথা না বলে কি থাকতে পারো না তুমি? কেন—সাদাসিধে কথা বলতে কি জরিমানা লাগে?

বলছি তো বলা যায় না। সত্যি তুমি যদি নতুন কিছু না ত্থাখো—পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি গালছি—তেরাত্তির জলস্পর্শ করবো না বাড়িতে। খিলখিল করে হেসে উঠেছে প্রমীলা।

—বাড়িতে না কর, রাস্তায় করতে তো আর দোষ নেই।

রাস্তায়ও না, তোমার চোখ এড়ানোর তো উপায় নেই। হাজারটা চোখ তোমার। এখান থেকে বসে বসেই তো সমস্ত দেখতে পাও তুমি। এটাতো আর মিথ্যে নয়?

না। মনে মনে ভেবেছে প্রমীলা, শ্যামসুন্দরের জানতে বাকী নেই প্রমীলার মন, প্রমীলার মেজাজ। রান্নার সময় কোন কৌতুক-তামাশা মোটে পছন্দ করেনা প্রমীলা। রান্নাঘরে রণচণ্ডী সে। ছ'বছরের অমল আর চার বছরের বুলবুল এলেও বিরক্ত। খুন্তি নিয়ে তাড়া করবে। মার খাওয়ার ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায় ওরা। শ্যামসুন্দরের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলে, বুকের ধুকপুকুনি থামে তবে।

পেটুক মানুষ শ্যামসুন্দর। নতুন জিনিষ দেখাতে না পারলে নির্দ্বিধায় খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবে প্রমীলা; কেউ ওকে কথার ছলেও ঠকিয়েছে বুঝতে পারলে, ক্ষেপে আগুন। সে আপনই হ'ক আর পরই হ'ক। তাদের কাছে ও নির্মম ও মমতাহীন।

ভাতের হাঁড়িতে সরা ঢেকে দিয়ে উঠে পড়ল প্রমীলা। বলল, যাচ্ছি। এখনো হুঁশিয়ার হও। না হলে বুঝতে পারছো তো? এই গরম হাঁড়ি মাথায় ফাটবে।

—এসেছে। সত্যিই কল্পনা করা যায় না। কি বীভৎস কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

ধানের শীসের মাথা কাঁপছে থরথর করে। ক্ষেত কাঁপছে, গাছ-গাছালি কাঁপছে, পাহাড় কাঁপছে। পাহাড়ের এই গুহাটার বাইরে বসেই দেখেছে সব। পাশে শ্যামসুন্দর। পরিষ্কার দিনের আলো। যত সাহসীই হ'ক প্রমীলা, বিপদ যে হিংস্র থাবা বাড়াবে না, বাড়াতে পারে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা সত্ত্বেও প্রমীলার বুকের তলায় কাঁপুনি ধরেনি একটু, তা নয়। ধরেছিল।

এমন ঘটনা যে, চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

বাচ্চা হাতীর মা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। ওর বাচ্চার শুঁড়টাকে অজগরের মুখ থেকে বার করতে না পারা পর্যন্ত নিস্তার নেই। পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাতেও পেছপাও হবে না। গাছের ডাল ভাঙচে মড়মড় করে। চড়চড় ক'রে উবড়ে ফেলছে বড় বড় গাছ। শুঁড়ের ফাঁকে গাছ ধরে ডাল ধরে অজগরের ওপর আঘাত হেনে চলেছে একনাগাড়ে।

প্রহারে প্রহারে জর্জর হয়ে পড়েছে অজগরটা। তবু যা গিলেছে তা উগরনোর নামগন্ধ নেই। কপালে মরণ লেখা আর কাকে বলে। অজগরটা নেতিয়ে পড়ল। মুখ খুলে গেল। তবুও রাগ যায়নি মা-হাতীর। অজগরের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিতে ওব পরিতৃপ্ত হয়েছে।

এটা বছর দশেক আগের ঘটনা।

প্রমীলার মনে হচ্ছে, সে বুঝি মা-হাতী। আর অজগর? অজগর—রত্নেশ্বর। শ্যামসুন্দর অমল বুলবুল—তিনটে মুখ ওই অজগরের নিশ্বাসের টানে ওই দিকেই এগোচ্ছে।

সামনে একটা আধপোড়া কাঠ পড়েছিল। শিবরাত্রির দিনে মেলায় কোন সাধুসন্ত এসে বাঘের ভয়ে ধুনি জ্বালিয়ে ছিল হয়তো। কাঠটার দিকে নজর পড়ল প্রমীলার। হাসির রেখা ঠোঁটের ফাঁকে। তুলে নিল।

হাতীর বল এসেছে শরীরে। পাহাড়টাকেও ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলবে সে আজ। রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে ঠকঠক ক'রে।

প্রমীলার রাগ যে দেখেনি রত্নেশ্বর, তা নয়। বহুবার দেখেছে। কিন্তু এরকম রণরঙ্গিনী মূর্তি আগে দেখেনি। ভেবেছিল, নিজের মুঠোয় এনে ফেলেছে প্রমীলাকে। তার কাছে প্রমীলার আত্মসমর্পণ ছাড়া কোন পথ নেই। আর প্রমীলা স্বেচ্ছায়ই তো আত্মসমর্পণ করার জন্য এসেছে। আসতে বলেছে।

আত্মসমর্পণের মূর্তি এটা নয়। তাকে খুন করার মূর্তি এ। কি করবে রত্নেশ্বর? কি করে প্রাণ নিয়ে বেরুবে এই মরণগহ্বর থেকে? মনোবল ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে, সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ু শিথিল, অবশ। নিজের দু'পা নিজের নয় যেন। দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলছে। এভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না আর। মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

হাসছে প্রমীলা। হাসিটা ভয়ঙ্কর ঠেকছে। বাঘিনীর হাসি। নিজের কব্জায় পেয়ে পৈশাচিক উল্লাস। পোড়া কাঠে কি যাদু আছে কে জানে। কাঠটা হাতে তুলে নেয়ার পর থেকে মৃত্যু ভয়ে ভেতরটা শুকিয়ে উঠছে রত্নেশ্বরের। আঘাতে আঘাতে আর শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বার করে না দিতে পারলে রক্তের তৃষ্ণা মিটবে না বুঝি ওর।

কামনাঝরা দৃষ্টি দেখে, ক্ষেপে উঠল আচমকা প্রমীলা। রত্নেশ্বরের কাছে এটা বিস্ময়। ক্ষেপার কথা নয়। প্রমীলার আগের ব্যাপার-স্যাপারে মেলামেশায় তাকে নিয়ে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায়—প্রমীলা যে পুরোমাত্রায় আকৃষ্ট—এটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি রত্নেশ্বরের।

মৃত্যু এসে গেছে মুখোমুখি। প্রমীলাই বাঁচিয়েছে। বরাবরই প্রমীলার সহানুভূতি লক্ষ্য করেছে। প্রমীলার দৃষ্টি যে সদাসর্ব্বদা তাকে ঘিরেই ঘোরাফেরা করছে, করে—এটা নজর এড়ায় নি যেমন তার নিজের তেমনি অন্যেরও।

প্রমীলার জন্যই মোতিনগর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনি, করে না রত্নেশ্বরের।

একদিনের জীবনদায়িনী হঠাৎ এমন প্রাণঘাতিনী হয়ে উঠল কেন? নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করল রত্নেশ্বর? মুখে প্রশ্ন করতে সাহসে কুললো না। আর তাছাড়া বোবা হয়ে গেছে যেন। নিজে যে কথা কইতে পারত কোনদিন মনে হচ্ছে না। চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেলেও বেঁচে যায়। প্রমীলার এ ভয়ংকরী মূর্তি দেখতে হয় না আর।

কর্পূরের পাতায় মাটির হাঁড়িটা ভর্তি করে, সরা দিয়ে গোটা হাঁড়িটা মায় সরাসুদ্ধ মাটির প্রলেপে ঢেকে দেয়া হ'ল। দুধারে খাড়া করে ইঁট পাতা। মধ্যিখানে কাঠ জ্বলছে। হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে দেখছে লোচন। দেখছে না তো ধ্যান করছে কর্পূরের। কতক্ষণে পাতাগুলো নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলে। নিঃশেষের নির্যাস বাষ্পে বাইরে হাঁড়ির গায়ে এসে জেঁকে বসে কতক্ষণে।

আগুনের তাপে মাটির প্রলেপে রেখা পড়ছে সরু সরু। জমছে বাষ্প। রেখায় রেখায় ফুটে উঠছে তুষারের লেখা! কর্পূরে-কর্পূরে ছেয়ে গেল হাঁড়িটা।

সুগন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। বুক ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে প্রমীলা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। দু'চোখ বুজে আসছে। কোন স্বপ্নের রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কর্পূরের আরতি হচ্ছে শিবমন্দিরে। বুড়ো ঠাকুরমা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলছে, বল! মনে মনে বল! ভোলানাথ তোমার মতো বর দিও।

প্রমীলা!

ভীতসন্ত্রস্ত গলায় ডাকল শ্যামসুন্দর। গলা খাটো করে বলল, মহাবিপদ। এইমাত্র কানাঘুষা শুনে এলুম।

ধ্যান ভেঙেছে। ন'বছর থেকে একুশে ফিরে এসেছে একলাফে। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা বেদনা মোচড় দিয়ে উঠল প্রমীলার।—কি বিপদ! কি শুনলে?

—নূপুরকে নিয়ে অনেক গণ্ডগোল।

—রত্নেশ্বর কোথায়?

—তাকে নিয়েই তো যত কাণ্ড। নূপুরের পেছু পেছু ঘুরছিল কদিন। আজ ওষুধ নিতে এসেছিল। হাত ধরে ছাড়তে চায়নি কিছুতেই রত্নেশ্বর। চিৎকারে পড়শীরা এসে পড়েছে। খবর গেছে নির্মলপ্রসাদের কাছে। কার স্ত্রীর হাত ধরা বুঝিয়ে দেবে নির্মল-প্রসাদ। কে না জানে নির্মলপ্রসাদ একটা ডাকসাইটে গুণ্ডা। একেবারে কেউটে সাপের ল্যাজে পা। খুন করে মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে।

ধ্যান-স্মৃতি মুছে গেছে নিমেষে। কর্পূর তৈরি দেখার সখ মাথায় উঠেছে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়েছে প্রমীলা।

বাড়ীতে এসে দেখেছে লোকেলোকারণ্য। অপেক্ষা করেছে নির্মলপ্রসাদের আসার। দাওয়া থেকে আঙিনা থেকে চলে যেতে বলেছে প্রমীলা সকলকে। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। দাওয়া থেকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেয় মাদুরের ওপর বসিয়েছে নূপুরকে। শাড়ীর আঁচলে সযত্নে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছে, বোন। ও তোমার দাদা। ভুল বুঝছো ওকে! হাতের নাড়ী দেখতে গেলে, হাত না ধরলে, কেমন করে দেখবে? তুমি ভুল বুঝেছো।

নূপুরের ভিজে গলায় রোষের আগুন জ্বলে উঠল দপ করে।—মেয়েছেলে হয়ে একথা বলছেন কি করে আপনি?

আমি হাতে ধরে বলছি তোমায়—এই কথাটা তুমি বলবে নির্মল-প্রসাদের সামনে। আমার মুখ চেয়ে অন্তত। না হলে একটা মানুষ খুন হয়ে যাবে।

হুঁক। ও রকম বদমাশ মানুষের না বাঁচাই ভালো।

এবারটা ক্ষমা কর আমায় কথা রেখে। ফের যদি কিছু করে, যা খুশি কোরো তোমরা। আমি কিচ্ছু বলবো না, কিচ্ছু বলবো না—শিবের নাম করে বলছি।

কেঁদে ফেলল প্রমীলা।

নূপুর দিদি বলে। বিপদেআপদে অনেক সাহায্য পেয়েছে এই দিদিটির কাছ থেকে। ঘরে চাল নেই, নিয়ে গেছে। দিদির ভাঁড়ারে ওদের খাবার মতোই ছিল, তা সত্বেও নিরাশ করেনি। নূপুর নিতে চায়নি। বলেছে, আপনাদের কি হবে গো?

আমাদের ঠিক হয়ে যাবে। এখুনি ব্যবস্থা করছি আনার। তুমি নিয়ে যাও তো। ভাবতে হবে না অতশত।

পরনে কাপড় নেই। গাঁট বাঁধা শতছিন্ন কাপড় পরে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখেছে দিদি আপদমস্তক। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে।—নির্মলটার কি মাথার ঠিক হল না এখনো? চাষবাস করবে না কাজকর্ম করবে না, খালি আড্ডা আর টো-টো কোম্পানী। একবার পাঠিয়ে দিও তো। আচ্ছা করে ধমকে দিতে হবে। বউ-ছেলের দায়িত্ব নিতে পারবে না যখন, বিয়ে করেছিল কেন?

ঘরে গিয়ে প্যাটরা খুলে একটা নতুন শাড়ী বার করে এনে, জোর করে পরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমি তোমার দিদি। যখুনি কোন দরকার পড়বে—সে রাতবিরেত হলেও সটান আমার কাছে চলে আসবে বোন।

নূপুর আসে দিদির কাছে।

দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে তার ছেলেমেয়েরও দরকার মেটায়। কখনো দুধের দাম কখনো জামাপ্যান্টের দাম—এ তো মাসে মাসে বাঁধাধরাই হয়ে গেছে একরকম।

প্রথম এসেছিল এ বাড়ীতে ওষুধ নিতে। পেটের ব্যথায় ঘুমের অব্যর্থ ওষুধ। ঘুম পাড়ায় ব্যথা কমায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এ তল্লাটে খুব নাম। ওষুধ দেয় শ্যামসুন্দর, ওষুধ দেয় রত্নেশ্বর। শ্যাম-সুন্দরের কাছেই এসেছিল। কিন্তু রত্নেশ্বর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওষুধ দিয়ে বলেছিল, তোমাদের যখুনি কারো অসুখ-বিসুখ করবে—আমার কাছে চলে আসবে।

এ বাড়ীতে আসাআসির সূত্রপাত এই।

যতবার এসেছে, দিদি কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে ওষুধ নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

নূপুরকে দেখলে, রত্নেশ্বর খুশী হয়ে উঠত। দুচোখে হাসি ছলকে উঠত। ওদের মহল্লায়ও যেতে শুরু করল প্রায়ই। দেখা হলে বলত, রুগীরা কে কেমন আছে, দেখা কর্তব্য বলেই, আসতে হয়।

আজ এসেছে নূপুর ওষুধ নিতে। বাড়ীতে কেউ ছিল না। ওষুধ দেয়ার নাম করে ঘরে নিয়ে গিয়ে হাত ছাড়তে চায় না আর কিছুতেই। অনেক অনুনয়বিনয় করেছে নূপুর।—বাবু, আপনি আমার দাদা, ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেবো কি! তোমায় দেখার জন্য মন কত অস্থির হয় —তা কি তুমি একটুও বোঝো না?

বাইরে কোলাহল উঠছে। মেরে ফেল কেটে ফেল। নির্মল-প্রসাদের গলার আওয়াজ শুনছে নূপুর। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে আজ দেখে নোব। ওকে কে বাঁচায় দেখি, কার বুকের কত পাটা।

দেখল নূপুর প্রমীলার দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হল। উঠে দাঁড়াল। বাইরে এসে চিৎকার করে বলল, কেন মিছিমিছি গণ্ডগোল পাকাচ্ছো তোমরা?

এগিয়ে এলো নির্মলপ্রসাদ।—যা শুনেছি সত্যি? তোর হাত ধরে আটকে রেখেছিল ঘরে—ছাড়ছিল না—চিৎকার করে কাঁদছিলি তুই?

—না, না। একটুও সত্যি নয়। হাত ধরে নাড়ী দেখছিল। আটকায়নি। কেঁদেছি রোগের যন্ত্রণায়।

মাথা নিচু করে চলে গেছে সকলে। চলে গেছে নির্মলপ্রসাদও।

শ্যামসুন্দর ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটনো কুঁড়েঘর—পাকাঘরও ঘুমিয়ে পড়েছে গভীর নিশীথে। ঘুমোয়নি

প্রমীলা আর ঘুমোয়নি রত্নেশ্বর। এঘর অন্ধকার—অন্ধকার আকাশের মতো। ওদিকের ঘরটায় আলো। লণ্ঠন জ্বলছে। এদিকে অন্ধকারে প্রমীলা জেগে বসে তক্তপোষের ওপর। ওদিকে তক্তপোষের ওপর জেগে বসে রত্নেশ্বর। গালে হাত দিয়ে, দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রমীলার প্রতীক্ষায়। এখনো তো আসছে না।

তক্তপোষ থেকে নামল প্রমীলা।

ডানপাশে বাঁপাশে চোখ ফেরাল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে শ্যামসুন্দর। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বুলবুল,—অমলও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল। দালান পেরিয়ে রত্নেশ্বরের ঘরে এলো। ঘুমোও নি?

উত্তর দিলনা। চুপ করে চেয়ে রইল রত্নেশ্বর। অভিমানে মুখখানা ভার ভার।

দরজার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল মনে হল প্রমীলার। ফিরে তাকাল। কে যেন সরে গেল। প্রমীলা ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘরে ফেরার জন্য। কে আসবে এত নিঃশব্দে? শ্যামসুন্দ? না। শ্যামসুন্দরের অগাধ বিশ্বাস প্রমীলার ওপর। তবে কে? ছেলেমেয়ের মধ্যে কেউ? বড় মানুষের মতো তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারবে না। অমল ছয়, বুলবুল চার, একদম বাচ্চা ওরা।

রত্নেশ্বরকে দোরে খিলতাড়া দিয়ে শুয়ে পড়তে বলে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে।

ঘরে।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল প্রমীলা। বিছানায় বসে শ্যামসুন্দর। দেখছে। প্রমীলা বসল নিজের বিছানায়। ছেলেমেয়েরা তেমনিই ঘুমিয়ে রয়েছে। ওদের পাশে বসল আস্তে আস্তে। শুয়ে পড়ছে।

—শুয়ো না। কথা আছে। প্রমীলা উঠে বসল আবার।

অনেকদিন ধরেই এ কীর্তি দেখে আসছি। ভেবেছিলুম, ছেলে

বড় হচ্ছে মেয়ে বড় হচ্ছে। নিজে নিজে শুধরে নেবে। শুধরে নেওয়া দূরে থাক—আরো বাড়াবাড়ি হয়ে উঠছে। সহ্যেরও একটা সীমা-পরিসীমা আছে। কোন্ রক্তমাংসর শরীরের মানুষ নির্বিকার চিত্তে সন্ন্যাসীর মতো স্ত্রীর এসব ব্যাপার বরদাস্ত করতে পারে—বলতে পারো? বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়ানো?

উত্তরের আশায় চেয়ে রইল প্রমীলার ঠোঁটের দিকে। কয়েক মুহূর্ত। ঠোঁট নড়ল না কাঁপল না। স্থির শান্ত।

—আমি একাই বকে যাব স্রেফ, আর তুমি বোবা কালার মতো চুপচাপ বসে থাকবে। এ মন্দ মতলব নয় দেখছি। শোনো, আবার বলছি তোমার স্বভাব পালটাও। রাতে ঘুম ভেঙে ছেলেমেয়ে উঠে পড়ে যদি, মাকে খোঁজে যদি ওরা—আমি কি উত্তর দোব? বল, তুমি কি উত্তর দেবে? একলা ঘরে মাথা কুটতে ইচ্ছে করে দেয়ালে। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

শ্যামসুন্দর থেমে গেল একটু। বাইরের দিকে তাকাল। রত্নেশ্বরের ঘরের আলো নিভেছে। বন্ধ হয়েছে দরজা। খানিকটা স্বস্তিবোধ করল। জোড়হাত করে বলল, দোহাই তোমার, ও ঘরে রাতে যাওয়া বন্ধ কর।

—আমার কথা তুমি কি শুনেছো? কি করে আশা কর তোমার কথা শুনবে অপরে? মাথার বালিশের তলা থেকে গায়ে দেবার চাদরটা টেনে বার করে ভাঁজ খুলল। চওড়া ক'রে পা থেকে মাথা অবধি ঢেকে নিল। মৃদু মচ্ মচ্ আওয়াজ হ'ল চৌকিটার। পেছন ফিরল প্রমীলা।

এ যেন এক মৃত্যু যন্ত্রণা। কাউকে বলার উপায় নেই, আবার না বলেও থাকা যাচ্ছে না। শুতে পারছে না বসতে পারছে না। ঘুম আসছে না চোখের পাতায়। উঠে পড়ল। পায়চারি করছে। নিজে হাতে বিষ করেছে পান। প্রমীলার মাথার কাছে এলো। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। শোনা যায় অন্যায় যে করে তার নাকি

অন্তর্দাহের অন্ত নেই। মিথ্যে মিথ্যে—সমস্ত মিথ্যে। কই,—এত বলা হল—কানে ঢুকল কোন কথা প্রমীলার ?

চোখের সামনে দেখছে শ্যামসুন্দর প্রমীলার কাণ্ড-কারখানা। এটাকে কি ন্যায় বলে মেনে নেবে প্রমীলার কথা অনুযায়ী ? বহাল তবিয়তে রয়েছে প্রমীলা, খোশ মেজাজে রয়েছে রত্নেশ্বর। কি সুবিচার ঈশ্বরের। ভাল মানুষেরই যত দুঃখ যত বেদনা যত অশান্তি। রাতে-দিনে—সারাক্ষণ দুর্ভাবনা আর দুর্ভাবনা।

অপরাধ, বন্ধুকে ভালোবেসেছে প্রাণ ঢেলে। নিজের ছোট ভাই বলে লোকের কাছে পরিচয় দেয়। কে এমন উদার হবে তার মতো। অপরাধ, স্ত্রীকে বলেছে তাকে যত্ন না করে বন্ধুকে যেন বিশেষ যত্ন করা হয়। অপরাধ, বন্ধু বড়লোক হতে চেয়েছে পয়সার দিক দিয়ে, সাহায্য করেছে রোগ সারানোয় মোক্ষম ওষুধের কথা জানিয়ে।

বর্ধমানের মাসুরাগাঁয়ে জন্ম দুজনেরই। প্রায় সমবয়সী। পাঠ-শালা স্কুল-কলেজ সব একসঙ্গে পড়া। ওষুধের ব্যবসায় চমনলালের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দিয়েছে। এখানেও নিজের বাসায় রেখে দু'জনে মিলে ব্যবসা করছে—রোগ সারানোর ব্যবসা।

স্ত্রীর ওপর কোনদিন কর্তৃত্ব করেনি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তবু মন পায়নি। শাসানিই শুনেছে কেবল। এটা সৎ-ব্যবসা নয়। মানুষের যন্ত্রণা কমানোটা নাকি মানুষের সর্বনাশ করা—প্রমীলার মতে। পাপ বলে যদি কোন বস্তু থাকে—তবে এর মতো পাপ দুনিয়ায় আর নেই।

শ্যামসুন্দরের বিরুদ্ধাচারণ করা প্রমীলার ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু রত্নেশ্বরের বেলায়। এখানে স্বামী-আজ্ঞা শিরোধার্য। পাছে যত্নের ত্রুটি হয়—সেই নিয়ে রাতেদিনে চিন্তাভাবনার শেষ নেই। ছেলেমেয়ের ওপর নেই টান, নেই শ্যামসুন্দরের ওপর। সবার টান এক করে রত্নেশ্বরকে টেনে রেখেছে প্রমীলা।

রত্নেশ্বরের ওপর একটা অদ্ভুত রকমের টান প্রমীলার। চোখে পড়ার মতো। এ নিয়ে নানা জনে নানা কথা কয়। প্রমীলা কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। শ্বশুর বাড়ি থাকার সময় থেকেই একথা ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। সমবয়সীরা এসে বলেছে, একি শুনছি রে প্রমী? হেসে কুটিকুটি হয়েছে প্রমীলা বাচ্চা মেয়ের মতো। ছড়া কেটে-কেটে বলেছে, "যে যা বলে বলুক লোকে আমার তাতে কি, পচাপুকুরের পাঁক তুলে সবার মুখে দি।"

এই টান শুনে একজন কিন্তু সত্যিসত্যিই খুব খুশী। জবা। প্রমীলার মকর। সেটা মকরসংক্রান্তির দিন। দুই সই চান করে উঠল পুকুর থেকে। ভিজে সপসপ করছে দুজনের কাপড়। চুল চুঁইয়ে টসটস করে জল ঝরছে। পূব আকাশে সোনালী আর লালের আভা। মিঠে তেজের সূর্যের দিকে তাকিয়ে দুজনেই একসঙ্গে পরপর তিনবার বলল, আজ থেকে জবা আমার মকর, আজ থেকে প্রমীলা আমার মকর।...দু'জনে দু'জনকে ভুলবো না কখনো। দু'জনের বিপদে আপদে দু'জন প্রাণ দিয়ে দেখবো। মৃত্যু অবধি মন থেকে কেউ কাউকে ছাড়বো না কখনো।

জবা আসে। সইকে জড়িয়ে ধরে। আনন্দে দু'চোখের কালো তারা জ্বলজ্বল করে ওঠে।

মোতিনগরে আসার দিনও জবা এসেছে। রত্নেশ্বর সঙ্গে যাচ্ছে দেখে, আড়ালে ইশারায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছে, মকর রে! তোর মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

বেরুনোর সময় হয়ে আসছে। প্রমীলা কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েছে শ্যামসুন্দর। দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে চোখের জল ঢাকার জন্য।

মোতিনগরে এসেও জবাকে ভুলতে পারেনি প্রমীলা। বরং আরো বেশী করে মনে পড়ে ওর মুখখানা। মনে পড়ে ওর কথা—

—মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। পূর্ণ হবার আশা তো কম। পয়সা উপায়ের লোভে, রাতারাতি বাদশাহ বনে যাওয়ার প্রবল বাসনা শ্যামসুন্দরকে যেমন নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার রাজ্যে তেমনি রত্নেশ্বরকেও।

দেখেশুনে অস্থির হয়ে পড়ে প্রমীলা। দালান দিয়ে যেতে যেতে চমনলালের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সর্বনাশ আর কাকে বলে! এই ওষুধ। এই মারাত্মক ব্যবসা করার জন্য দেশ থেকে চলে এলো শ্যামসুন্দর চমনলালের পরামর্শে। এ ব্যবসা যে নিরীহ সরল লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এত বড় নির্দয়ও হতে পারে মানুষ! শ্যামসুন্দর কি! রত্নেশ্বর কি! চমনলাল কি!

নিষেধ করেছে। হাতে ধরেছে, পায়ে পড়েছে।—এযে খুন করা গো। এর চেয়ে দেশে ফিরে চল। নুনভাত খেয়ে থাকবে আমার ছেলেমেয়ে, সেও ভালো। ক্ষীরছানা খেয়ে দরকার নেই। এভাবে রোজগারের পয়সা সইবে না আমাদের। সইতে পারে না কারো। ছেলেমেয়ে দু'টোর মুখ চেয়ে একাজ ছাড়ো। ওদের বাঁচতে দাও।

সম্পত্তি—অর্থের মোহ এমন—সেখানে স্ত্রী-পুত্র কোন প্রিয়জনই তেমন প্রিয় নয়—তেমন আপন নয়। প্রমীলার কথা কানে নেয়নি শ্যামসুন্দর। কানে নেওয়াটা প্রয়োজন বোধ করেনি। ভেবেছে প্রমীলার এসব সংস্কার কেটে যাবে দিন কতক পর। গয়না বাড়ি দেখলে ও-ও অন্য রকম হতে বাধ্য। ছ'মাসের ছেলের সামনে টাকা ধরলে হাত বাড়ায়, আর প্রমীলা।

প্রায় আট-ন'বছর হয়ে গেছে, প্রমীলা কিন্তু প্রমীলাই রয়েছে। এবিষয়ে কোন আপোস নেই তার; প্রতিদিন বলে শ্যামসুন্দরকে, যা চলছে, ভালো নয়। নিজেদেরই অমঙ্গলকে ঘরে ধরে রেখে পোষা হচ্ছে।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছে শ্যামসুন্দর।—তোমার পাগলামো আর

গেল না। আমরা লোকের অপকার ছাড়া উপকার করছি বল তো? ও-হো, থুড়ি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। উপকার ছাড়া কার অপকার করছি?

গ্যাখো সত্যি এমন জিনিষ। মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কথায় বলে, মনের অগোচরে পাপ নেই। প্রথমটাই আসল। অপকার ছাড়া উপকার কার করছি....। এখনো ওপথ ছাড়ো। সাবধান হও।

বিশ্বনাথ এসে পড়তে কথা এগোয়নি আর। হোঁচট খেয়েছে। বিশ্বনাথ সর্বস্বান্ত হয়েছে ওষুধের গুণে। পেটের যন্ত্রণা নিয়ে এলো বেচারা। আফিংগোলা জল খাইয়ে খাইয়ে ব্যাথা কমল। ওষুধ না খেলেই ব্যাথার দাপট দেখে কে। নিজের গায়ের মাংস পেটের মাংস ছিঁড়তে থাকে তু'হাতে করে বিশ্বনাথ। ওষুধ পেটে পড়লে ঝিমুনি আসে। ওইটুকুই তো আরাম। ঝিমুনি কাটলেই তো যমযাতনা।

লোকে বলে, রোজই ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে। ওষুধে নেশা ধরে। বিশ্বনাথ বলে, নেশা না ধরলে বাঁচবে কেমন ক'রে আহাম্মকরা? শ্যামসুন্দরবাবু রত্নেশ্বরবাবু যা বলেছেন হক-সত্যি। বলেন, পয়সা তো হাতের ময়লা। প্রাণটা আসল। মানুষ বাঁচলে তবে না? পয়সা যাক, বাড়ি যাক, জমি যাক—কোন তুঃখ নেই। মানুষ বাঁচুক। ওরকম বাড়ি জমি বহুত হবে। নিজে ওষুধ খেয়ে খেয়ে আর গুষ্টিশুদ্ধকে খাইয়ে ফতুর বিশ্বনাথ। তবু খেদ নেই। প্রাণটা রয়েছে এখনো তো এইতুটি ধন্বন্তরির জন্য, এইটাই তো ওপরঅলার মেহেরবানি।

লোকটাকে দেখলেই সর্বশরীর জ্বলে ওঠে প্রমীলার। পুরুষ নয়, মেয়ে। কোন ক্ষমতা নেই। নিজে নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়ার দাখিল হয়েছে। সংসারটাকে জাহান্নামে পাঠাতে শুরু করেছে। এসব না করে এই তু'টোকে গলা টিপে শেষ করতে পারলে, একটা

কাজের মতো কাজ করত। প্রমীলা ওর স্বপক্ষে দাঁড়িয়েই কাছারিতে গিয়ে এজাহার দিয়ে আসত।

মনের ইচ্ছাটা গোপন করেনি প্রমীলা শ্যামসুন্দরের কাছে।

বিশ্বনাথকে ডেকে এনেছে শ্যামসুন্দর। বিশ্বনাথ যে কত উপকৃত তাদের কাছে, বলিয়ে বাহাদুরি কুড়বার জন্য প্রশ্ন করেছে।—প্রমীলা বলে, তুমি নাকি আমাদের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পথে বসেছো। কি দরকার তবে ওষুধবিষুধ খাবার? আর এখানে আসারই বা দরকার কি?

দু'চোখ কপালে তুলে, ভাঙা গলায় বলেছে বিশ্বনাথ। —একথা মুখে আনবেন না বাবু আর। মরে যাচ্ছিলুম, বাঁচালেন। বাড়ি-জমি গেলেও কি মানুষ বাঁচে? আসা বন্ধ করার আগে মেরে ফেলুন। আপনি বাঁচিয়েছেন, আপনি মারুন।

গর্বের হাসি হেসেছে শ্যামসুন্দর। চোখ নামিয়ে আড় চোখে দেখেছে প্রমীলাকে। কিরকম প্রতিক্রিয়ার আচড় পড়ে মুখে। গুনগুন করে গান গেয়েছে, "তুমি মারিলে মারিতে পারো, রাখিতে কে করে মানা।"

বিদ্রূপের বিছুটি ঘষে দিয়েছে গায়ে প্রমীলার। প্রমীলা দাঁড়ায়নি আর একদণ্ড। নিজেকে বড্ড একা ঠেকেছে, বড় অসহায়। চলে গেছে নিজের ঘরে। মনে হয়েছে মনের ওপর দিয়ে দেহের ওপর দিয়ে ভীষণ ধকল গেছে। শরীর মাথা টলছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। শুয়ে পড়েছে বিছানায়। ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে মাথার বালিশ ভিজিয়েছে।

মনে পড়েছে মায়ের কথা, মনে পড়েছে বাবার কথা। বাবা বলেছে, শিবের মতো পাত্র পেয়েছি রে প্রমী। মা হাঁ-হাঁ করে বলে উঠেছে, থামো দিকিনি। আগে চারহাত দু'হাত হ'ক—বিয়েতে বিশ্বাস নেই কোন। আমার তো খুব বড়লোকের ঘরে আজ পড়ার কথা। পড়লুম? সব ঠিকঠাক। বাবা এসে বললে, সোনামণি

আমার রানী হবে। ছেলের বাপের মতো সদাশয় লোক আর নেই। হাকিম টলে তো হুকুম টলে না। সেই গোছের। কথা দিয়েছে। কোথায় রইল কথা? বিয়ের হু'দিন আগে বলে কিনা —যে ঘর করবে তার অমতে তো আর চলা যায় না। ছেলের মন ভাঙিয়েছে জ্ঞাতিরা। রঙটা বড্ড কটকটে। চোখে লাগে; কটাচুলের মেয়েরা নাকি স্বামীকে মুঠোয় পুরে রাখে। ওঠ বললে উঠবে, বোস বললে বসবে। বিয়ে ভাঙল। রানীর জায়গায় ছাপোষা ঘরে এসে পড়লুম শেষে।

মায়ের মতো মেয়ের বিয়ে ভাঙেনি। ভাঙলে কিন্তু ভালো ছিল। ভালমানুষের খোলস পরা মানুষটার ভেতর কালো। বিষে বিষে ভরা। যে দেশে জন্মেছে। সে দেশে সাপের বিষ নেই। গোখরো সাপের রাজ্য। প্রতি ঘরে হু'দশটাকে দেখতে পাওয়া যাবেই। কিন্তু আশ্চর্য, কামড়ায় না। কামড়ালেও মানুষের রক্তে বিষ খুঁজে পাওয়া যায় না একবিন্দু। এগাঁয়ে গোখরোর দাঁতের থলিতে মৃত্যুবিষ নেই।

বিয়ের পরে গাঁয়ে গিয়ে আশ্চর্য হয়েছে শুনে। অবিশ্বাস্য কথা। থাকতে থাকতে স্বচক্ষে দেখেছে সমস্ত সত্যি। একবর্ণও মিথ্যে নয়। এতটুকু বাড়িয়েও বলা নয়।

আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে এই সাপ পুজোর কি বিরাট উৎসব হল। ছেলেদেরও দেখা গেল এই সাপ নিয়ে খেলা করতে। নির্ভয়ে খেলা করছে ওরা। কতলোক পুজো করছে মন্দিরে। এই সাপকে ঝাংলাই দেবী বলে।

শ্বশুর বলেছে প্রমীলাকে, ঝাংলাইয়ের জন্য এগাঁয়ে অন্য কোন বিষাক্তসাপ আসে না কখনো। শ্বশুরের কথাই যথার্থ হয়েছে। যতদিন ছিল প্রমীলা, দেখেনি অন্য কোন জাতের বিষাক্ত সাপ।

কিন্তু এই বিষহীন সাপের দেশের ছেলে হয়ে এত বিষাক্ত কি করে হয়ে উঠল শ্যামসুন্দর। রত্নেশ্বরও তো কম যায় না। শ্যামসুন্দরের

সঙ্গে হরিহরআত্মা হলেও, এককাঠি ওপরে বরং। ছোটবেলা থেকেই ওর শিরাধমনীতে বয়ে চলেছে মারাত্মক বিষের স্রোত। ওর দৃষ্টিতে হাসিতে নিশ্বাসে পর্যন্ত বিষ।

ওর দৃষ্টিতে পড়বে যে মেয়ে, ওর হাসিতে মুগ্ধ হবে যে কেউ —তারা ওর নিশ্বাসের ঘূর্ণিঝড়ে পাক খেয়ে খেয়ে হাঁপিয়ে উঠবে। অনেকের পক্ষে ওর আওতা থেকে বেরুনো কঠিন।

যে ভাবে আফিংয়ের নেশা ধরাচ্ছে রত্নেশ্বর ছেলেবুড়ো সবাইকে, ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না মোটে। রত্নেশ্বরকেও ভয় ধরছে। অমল, বুলবুল বড় হয়েছে। অমল পনেরো-ষোল, বুলবুল তেরো-চোদ্দ। কাকামণি বলতে অজ্ঞান ওরা। ওঘর ছাড়তে চায় না একদম। কে জানে ছেলেটাকেও আফিং গোলা জল গেলাচ্ছে কিনা? মেয়েটাকে—

শিউরে উঠল প্রমীলা। চোদ্দ বছরে বিয়ে হয়েছে তার! রত্নেশ্বরের প্রকৃতি জানে সে, জানে রত্নেশ্বরের মন। ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে হবে বুলবুলকে। বাঁচাতে হবে অমলকে।

বলা-কওয়ার শেষ হয়ে গেছে দুই বন্ধুকে। প্রমীলা হার মেনেছে ওদের কাছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিনা জানে না। একটা নতুন চিন্তা মাথায় আসছে।

সে সময়ে কোচবিহারে—বাপের বাড়িতে। বিয়ের বছর দু'য়েক আগে।

বোশেখ জষ্ঠী আষাঢ়। তিনমাস ধরে খরা চলছে। বৃষ্টিঝড়ের নামগন্ধ নেই। হাহাকার পড়েছে দেশময়। সকলের দীর্ঘনিশ্বাসে একটি মাত্র শব্দ শুনছে সবাই—আকাল।

মরবে, গরুবাছুরের সঙ্গে মানুষও মরবে। কাঠফাটা রোদ্দুরে জলের সঙ্গে মানুষের রক্তও শুকোচ্ছে পাল্লা দিয়ে। ক্ষেতের জমি ফেটে চৌচির। বড় বড় হাঁ করে রয়েছে আকাশের দিকে। বিষন্নমুখে গালে হাত দিয়ে চাষারা বসে আছে আলের ওপর! শূন্যে দৃষ্টি! মেঘের ছিটে ফোঁটা নেই। চোখের জলে ঝাপসা দেখছে চতুর্দিক।

আকাশের লুকনো মেঘ কি চারিদিক ঘিরে নামল মাটির বুকে? ধুতির খুঁটে চোখ মুছে দেখেছে, মেঘ নয়। চোখের ধোঁকা।

চাষার বৌয়ের চোখেও জল স্বামীপুত্রের চোখ দেখে। স্থির থাকতে পারেনি ওরা। নিশুতি রাতে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে মেঘের আরাধনার জন্য। মেঘ আসবে ওদের ব্যাকুল আহ্বানে। নামবে বৃষ্টি।

উলুধ্বনি দিতে দিতে চলেছে বৌয়েরা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল মা। ওদের সঙ্গে যাবে, দেখবে। মায়ের কাছে শোয় প্রমীলা। ঘুম ভাঙল। মায়ের আঁচল ছাড়ল না। সে-ও যাবে।

গেছে একটা নির্জন মাঠের শেষ প্রান্তে। ধারে কাছে কোন বসতির চিহ্ন নেই। একটা লণ্ঠন জ্বলছে টিমটিম করে মধ্যিখানে। সদ্য পোঁতা কলাগাছটা ঘিরে নাচছে একদল বৌ। আর একদল হাততালি দিয়ে গান গাইছে এদিকে—

আরে ওরে নিদয়া ম্যাঘ
দ্যাখ নজর ঘুরিয়া....।
আরে ওরে নিঠুর ম্যাঘ রে,
আরে ওরে কটুর ম্যাঘ রে।
....এক ছলকা পাণি দ্যাও।
....কালা ম্যাঘ ধওলা ম্যাঘ
সোদর ভাই,
....এক ঝাক পাণি দ্যাও।

কম বয়সের দরুণ তখন অত বোঝেনি প্রমীলা। এখন বুঝতে পারছে, ওই গানের কথায় সুরে জলের জন্য আর্তনাদ। নির্দয় মেঘ নিষ্ঠুর মেঘ সদয় হও। জল দাও, জল দাও, জল দাও। বাতাস কেঁদে কেঁদে উঠছে।

কতক্ষণ গান নাচ চলেছিল, সময়ের ঠিক মাপ জানেনা প্রমীলা। তবে অনেক—অনেকক্ষণ ধরে এই নাচগান চলেছিল। সকলে সম্মোহিতের মতো শুনছে, দেখছে। অবিশ্যি সবাই মেয়ে।

পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এখানে।

হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে চমক ভাঙল দর্শকদের, শ্রোতাদের। পূজারিণীদের সম্বিৎ ফিরল বৃষ্টি ঝরতে।

কি করে এমন অঘটন ঘটল ভাবলে এখনো রোমাঞ্চ জাগে প্রমীলার সর্বাঙ্গে। এখনো বিস্ময়ের অবধি থাকে না। নিজের মনকে নিজে জিজ্ঞেস করেছে, সত্যি, না কাকতালীয়?

সত্যিই হক আর কাকতালীয় হক ঘটনাটা তো ভারী সুন্দর।

এই রকম সুন্দর ঘটনার মতো সুন্দর জীবন কি গড়ে তোলা যায় না শ্যামসুন্দরের-রত্নেশ্বরের? সকলের ইচ্ছে মিলেমিশে সম্ভব হলেও হতে পারে যদি কোন ব্যাপার—তার ইচ্ছেয় কি এদের একটুও পরিবর্তন হতে পারে না? চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এরা ভাল হলে, এদের খপ্পরে যারা পড়ছে, তারা রক্ষে পাবে। রক্ষে পাবে অমল-বুলবুল।

একা ঘরে বসে বসে প্রমীলা ভেবেছে প্রতিদিন। শ্যামসুন্দর-রত্নেশ্বরের বিবেকবুদ্ধি ফিরে আসুক। ফিরে আসুক, ফিরে আসুক। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভেঙে দেখেছে, ঘরে কেউ নেই। কখন বেরিয়ে গেছে শ্যামসুন্দর। ছুটে গেছে রত্নেশ্বরের ঘরে। বুলবুল হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রত্নেশ্বর গল্প শোনাচ্ছে। মেয়েটা তো ছেলেটার জন্য পাগল একেবারে....।

এ আবার কোন্ দেশী গল্প! বুলবুলের মাথাটা বিগড়ে দেবে রত্নেশ্বর। এমানুষকে আর এখানে রাখা সম্ভব নয়, উচিতও না। গম্ভীর গলায় বলল, বুলবুল! ও ঘরে যাও!

মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে গেল বুলবুলের। বেরিয়ে গেল।

তক্তপোষের ওপর গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমীলা। যেখানে বসেছিল বুলবুল। মুখে হাসির প্রলেপ টেনে, পা দোলাতে দোলাতে বলল, তারপর? মেয়েটা তো ছেলেটার জন্য পাগল একেবারে—

তারপর মেয়েটা কি করল ? আমাকে বলতে দোষ কি ?

আমতা আমতা করে বলল রত্নেশ্বর।—গল্প শুনতে চাইল বুলবুল, তাই বানিয়ে একটা বলছিলুম।

বানানোর শেষটুকু আমি এসে না পড়লে নিশ্চয় বলতে। আমাকে বলতে আপত্তি কেন, মুখে আটকাচ্ছে কেন ?

তোমাকে দেখলে আমি সমস্ত ভুলে যাই। মাথাটা কিরকম গুলিয়ে যায়।

শোন, একটা কথা বলে দিই তোমাকে। বাড়ি ফিরে যাও। ঘরের বাইরে রয়েছো আজ আট-ন'বছর। সেটাও কি ভুলে যাও আমায় দেখলে ? শেষের কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলল প্রমীলা।

তোমরা না গেলে, আমি ফিরে গিয়েও থাকতে পারবো না একতিল দেশে।

বুলবুলকে যদি পাঠিয়ে দিই ওখানে ? তোমার দেখাশোনা করবে ?

থতমত খেয়ে বলল রত্নেশ্বর—না।

বুলবুলকে তার ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি, তোমার দাদা আর অমল এখানে থাকব।

তুমি থাকলেই হ'ল!

শ্যামসুন্দর ঘরে ঢুকল।

তক্তপোষ থেকে নেমে পড়ল প্রমীলা। চৌকাঠের ওধারে পা বাড়াতে যাচ্ছে, হাত ধরে টেনে বসাল শ্যামসুন্দর।—বেশ তো বসেছিলে! আমি না হয় চলে যাচ্ছি।

প্রমীলাকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দর বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলাও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও রত্নেশ্বরের মনের ঘরে বাসা বেঁধে রইল। প্রমীলাকে নিত্যনতুন দেখে রত্নেশ্বর! এক একদিন এক একরূপ! পৃথিবীর সব নারীর প্রকৃতির ইট থরে থরে সাজিয়ে

বিধাতা একটি প্রমীলাকেই গড়েছে। প্রমীলা প্রমীলাই! তিরিশেও বিশের বাঁধুনি অটুট হয়ে রয়েছে! নিটোল গড়নে টোল পড়েনি কোথাও!

প্রমীলা রহস্যময়ী। ধরা দিতে এসেও ধরা দেয় না! ছুঁতে গিয়েও ছুঁতে পারে না রত্নেশ্বর! রাতে ঘুম হচ্ছে না! ছটফট করছে! কেমন করে জানতে পারে কে জানে! ঠিক আসে। বসে না। শুতে বলে চলে যায়। এতেই আশ্চর্যভাবে ঘুমের নেশা ধরে চোখে রত্নেশ্বরের! প্রমীলা তার চোখের ঘুম কাজের প্রেরণা মনের প্রশান্তি। কি যে নয়, তা রত্নেশ্বরও জানে না।

রত্ন নামটা এত মিষ্টি শোনায় প্রমীলার মুখে—ডাক শুনলে পাগল হয়ে ওঠে। ত্নুনিয়া ভুলে যায়। ওষুধ তৈরি ভোলে, রুগী দেখা ভোলে। ভোলে রূপসী মেয়ের আকর্ষণও। তুচ্ছ—অতিতুচ্ছ হয়ে যায় সব নিমেষে।

বাড়িতে নেই শ্যামসুন্দর, বেরিয়েছে আফিং সওদা করতে। রয়েছে রত্নেশ্বর। বুলবুল-অমলও নেই! পড়তে গেছে। প্রমীলা নিজের ঘরেই শুয়ে। মানসিক অবস্থা ভালো নয়। মেঘলা দিনের মত মনের আকাশেও মেঘ জমেছে।

যাওয়ার সময় শ্যামসুন্দরকে বলেছে, আবার আনতে যাচ্ছো? চেতনা হল না? সুহাসিনীর ছেলেটা কেন মারা গেল, তুমি তো জানো।

হঠাৎ বজ্রপাত হল যেন ঘরে।

এরকম রাগে ফেটে পড়তে দেখেনি কোনদিন শ্যামসুন্দরকে। এরকম জ্বলে উঠতে দেখেনি। চিৎকার করতেও না।

সকলের জন্যই তো ভেবে অস্থির হয়ে পড় দেখি! আমার জন্য তো কোন চিন্তাভাবনা নেই তোমার! কোথাকার কার তু'মাসের

বাচ্চা মরেছে, উনি অস্থির। জন্ম-মৃত্যু কি কারো হাত ধরা নাকি? পরমায়ু ফুরিয়েছে, গেছে। পরমায়ু না ফুরতেই এদিকে যে তিল তিল করে আমি মরছি—কে কত লক্ষ্য রাখছে? কে কত ভাবছে?

ঠিক আছে। তোমাদের কাজে বাধা দেয়ার লোক কেবল আমিই। বাধা দোব না আর।

হ্যাঁ, দিও না! দিও না!

শ্যামসুন্দর চলে গেছে। সুহাসিনীর কচিবাচ্চাটার মুখ ভেসে উঠেছে প্রমীলার চোখের সুমুখে। দেখাতে এসেছিল একদিন। রাতের কান্না বন্ধ করতে ছেলের শিশির বদলে ভুল করে বাপের শিশির দাওয়াই ঢেলে দিয়েছে গলায়। ছেলে ঘুমিয়েছে। সে ঘুম ভাঙেনি আর।

এসব কেমন করে সওয়া যায় দিনের পর দিন! প্রমীলাও যে মা। আবার ভেবেছে, শ্যামসুন্দর-রত্নেশ্বরের বুদ্ধিবিবেক ফিরে আসুক, ফিরে আসুক। যার সকল চেষ্টা ব্যর্থ! সম্পূর্ণ নিরুপায় যে, তার এ কামনা ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে?

প্রমীলার জ্বালা বুঝবে কে? বাইরে কারো কাছে প্রকাশেরও উপায় নেই।

ওদের বুদ্ধিবিবেক ফিরে আসুক, ফিরে আসুক, ফিরে আসুক। চিন্তা করতে পারছে না আর প্রমীলা। অবসন্ন হয়ে আসছে দেহ। রাজ্যের ঘুম নামছে দেহে মনে।

দালানের ওপারের ঘরে রুগী দেখছে রত্নেশ্বর। ফুলরানীর দোজবরে স্বামীকে নিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার কথা শুনছে আর মিটিমিটি হাসছে। নিজের মাথা ধরার কথা বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ছে একেবারে ফুলরানী মেঝেয়।—কি আর বলবো দাদা! ঘাড় নড়নড়ে বুড়োর খকর খকর কাশির জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। চোখেপাতায় এক করতে পেরেছি যদি কোন সময়। মাথার ব্যামো কি আর সাধে হয়েছে?

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাঁচে আর কদিন বল মানুষ। নেহাৎ মেয়েছেলের জান-বড় কঠিন। সহজে বেরুবার নয় এ।

অবুঝ প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে রত্নেশ্বরের। ক্ষীণজীবী বুড়োটা শেষ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আর কটা দিনই বা। তার আগেই শেষ হয়ে গেলে মন্দ নয়। রোগযন্ত্রণা থেকে রেহাই পায় আর ফুলরানীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। আফিংয়ের মাত্রাটা যে শিশির জলে বেশী, সেইটা হাতে নিয়ে নাড়তে লাগল।

নাড়ছে আর ফুলরানীর দিকে দেখছে। ফুলরানী হাসছে। হাসির ধমকে ওর দেহ নাচছে ওর চোখ নাচছে। সারা শরীরের রক্ত নেচে উঠছে রত্নেশ্বরের। মাতাল মাতাল ভাব। দরজা বন্ধ করার জন্য বাঁহাত বাড়াতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল যেন। প্রমীলা দাঁড়িয়ে দরজার পাশে। প্রমীলার ঠোঁট নড়ে উঠল। বলল, বিবেকবুদ্ধি ফিরে আসুক।

কথাটা শোনা মাত্র কেমন হয়ে গেল রত্নেশ্বর। হাত কেঁপে আফিং জলের শিশিটা পড়ে গেল মেঝেয়। ভেঙে চুরমার। ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের এখানে ওখানে। নিচের দিকে তাকাল একবার। মুখ তুলতেই দেখতে পেল না আর প্রমীলাকে!

দৌড়ে এলো প্রমীলার ঘরে। ঘুমোচ্ছে। রত্নেশ্বরের বুকের তলায় কাঁপুনি ধরেছে ভয়ে। প্রমীলাকে হারানোর ভয়। কে জানে—দেখে কি ধারণা হল প্রমীলার। তাকে এড়িয়ে চলার জন্যই এ ঘুম। সত্যি ঘুম নয় এটা। ডাকল, বৌদি, বৌদি!

ধড়মড় করে উঠে বসল প্রমীলা বিছানার ওপর। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, কি—হয়েছে কি? এত চেঁচামেচি করছো কেন?

বেশ আছো তুমি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে?

কি সঙ্গে সঙ্গে?

তুমি গেছলে না আমার ঘরে?

কি আবোলতাবোল বকছো বলতো?

তুমি গেলে, আমায় বললে—

চুপ কর। লোককে আফিং খাইয়ে নিজে এবার গাঁজা ধরেছো দেখছি।

ফুলরানীর কর্তার ওষুধ দিচ্ছিলুম বৌদি।

বেশ করছিলে।

তুমি ফিরে এলে—

ঘুমোচ্ছিলে নাকি ? স্বপ্ন দেখেছো।

স্বপ্ন !

হ্যাঁ, আমি যাইনি, ঘুমোচ্ছিলুম।

আশ্চর্য ! আমি জেগে ওষুধ দিচ্ছিলুম—তুমি গেলে—অথচ—

দরজার বাইরে শ্যামসুন্দরের গলা খাঁকারির শব্দ হল। ঘরে ঢুকল শ্যামসুন্দর। রত্নেশ্বর বেরুতে যাচ্ছে, বাধা দিল।—বোস না। বৌদি তোমার ঘরে গেছল কিছু দরকারের জন্য ডাকতে হয়তো। হ্যাঁ মনে পড়েছে। একটা কাজ সারতে তো ভুলে গেছি। বোস একটু। তোমরা দুজনে কথাবার্তা বল ততক্ষণ। আমি একটু আসছি। রত্নেশ্বরকে ধরার সুযোগ না দিয়েই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছে প্রমীলার। ঝড় ওঠার পূর্বলক্ষণ। রেগে গেলে এই রকমই হয়ে ওঠে মুখের ভাব। এখুনি বলবে, বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। মুখ দেখতে চাই না কারো আমি। পায়ে পায়ে সরে পড়ল রত্নেশ্বর।

ফিরেছে একেবারে বিকেলে শ্যামসুন্দর। আকাশের দিকে চেয়ে দাওয়ায় বসে আছে চুপচাপ প্রমীলা। আনমনা। পেছন দিকে দুবার পায়চারি করল শ্যামসুন্দর। খেয়াল নেই।

অগ্রাহ্য। শ্যামসুন্দরকে চায় না প্রমীলা। রত্নেশ্বরই ওর সব। শ্যামসুন্দর সরে গেলে নিশ্চিন্ত। আফিং কেনার সময় গেছল প্রমীলা। দূরে দেখতে পেয়ে কেনা আর হয়নি। বাড়ি থেকে

বেরুনোর সময় প্রমীলাকে অনেক কিছু বলে এসেছে। বলাটা ভালো হয়নি। দৌড়ে এসেছে বেচারা! টান না থাকলে কি আর আসতো?

কাছে আসতে শুনেছে হাড়জ্বালানো কথা।—বিবেক বুদ্ধি ফিরে আসুক....।

ব্যাপারীর ডাকে মুখ ঘুরিয়েছে। পলকের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে প্রমীলাকে দেখতে পায়নি আর। মনে হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে অভিমানিনী আফিংয়ের ব্যাপারীর দিকে তাকাতে।

স্থানত্যাগ করেছে তখুনি। হনহন করে চলে এসেছে বাড়িতে। দেখেছে, ঘরে মানঅভিমানের পালা চলছে ছ'জনের। কানে এসেছে, ঘরে যাওয়া নিয়ে রাগ অনুরাগের কথা।

সেই ভাবে এখনো বিভোর শ্রীমতী। মনে মনে রত্নেশ্বরকে দেখছে, কথা কইছে। তার আসা তার পায়ের শব্দ-অনুভবের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

দেখতে গেছল প্রমীলা, কোথায় আছে কি কাজে ব্যস্ত। ব্যস্ত দেখে, ভেবে নিয়েছে শ্যামসুন্দরের নজরে পড়েনি। সটকান দিয়েছে ওখান থেকে। বাড়িতে এসে একেবারে রত্নেশ্বরের ঘরে। প্রমীলার ছলনা ধরা পড়েছে হাতেনাতে।

পেছন থেকে সামনে এলো শ্যামসুন্দর। বলল, ওখানে গেছলে কেন তুমি? তোমায় জবাব দিতেই হবে—কেন?

আকাশ থেকে পড়ল প্রমীলা। দেখছে।

দেখার কিছু নেই। কেন গেছলে?

কোথায়—রত্নর ঘরে?

রত্ন—রত্ন—রত্ন! ওখানে যাও না যাও, সে খবরে আমাকে দরকার নেই। আমি যেখানে গেছলুম ছুপুরে, সেখানে কেন গেছলে?

রত্নর, তোমার ছ'জনেরই কি মাথা খারাপ হ'ল? কি বলছো তোমরা?

আমার প্রশ্নের উত্তর আমায় দাও! আমার সঙ্গে অন্যের নাম জড়াচ্ছো কেন?

আমি কোন জায়গায় যাইনি।

রত্নকেও তো বলেছি, ঘুমোচ্ছিলুম।

আঃ! সেই রত্ন! মিথ্যে কথা বলছো আমাকে। ঘুমোও নি। স্বচক্ষে দেখেছি, কথা শুনেছি। সাংঘাতিক মেয়েছেলে তুমি। আমি তোমাদের কণ্টক। তাই না? কণ্টক থাকবে না আর। শেষের কথাটা খুব চাপা গলায় বলতে বলতে চলে গেল শ্যামসুন্দর।

সে রাতে বাড়ি ফেরেনি আর। পরের সকালে ভুবন পাহাড়ের কোলে শ্যামসুন্দরের মৃতদেহ দেখেছে সবাই। শ্যামসুন্দর ভালো-বেসেছে আফিং। চিরজীবনের সঙ্গী করেছিল। শেষেরও সঙ্গী হ'ল।

লোকের শুভ-কামনায়ও যে প্রাণঘাতী ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, এটা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? পারে না। অবিশ্বাসের কথাই তো। অবিশ্বাস করলেও কিন্তু সত্যি। যেটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, সেটাকে অস্বীকারই বা করা যায় কেমন করে। যার তার ঘটনা নয় যে অতিরঞ্জন থাকবে। শোনা কথাও নয় যে বানানো গল্প বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে।

এ কাহিনী প্রমীলার নিজের জীবনের।

গোড়ায় বোঝেনি পরে বুঝেছে। একজন চলে যাওয়ার পর। শ্যামসুন্দর।

দিনেরাতে ভেবেছে শুধু ত্বজনে একই কথা বলল। ত্বজনেই দেখল তাকে, শুনল তার কথা—বিবেকবুদ্ধি ফিরে আসুক....। একই সময়ে দেখেছে ওরা তাকে। ওদের চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে যখন। ফল ফলেছে বিপরীত। ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ত্ব'জনেরই।

একজন চরম আঘাত হানল তাকে। আর একজন কি করবে —সেই ভয়। ভয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে প্রমীলা। বিবেকবুদ্ধি ফিরে আসুক। রত্নেশ্বরের চিন্তা করেছে ক'বার—এটা স্রেফ পরীক্ষা করার জন্যই। একই ব্যাপার ঘটেছে প্রতিবারে। ঘুমিয়ে পড়েছে। আর রত্নেশ্বর ছুটে এসে ঘুম থেকে তুলেছে তাকে। বৌদি তার ঘরে গিয়েই চলে আসছে কেন? কেন এমন লুকোচুরি খেলছে তার সঙ্গে?

প্রমীলা বুঝেছে, এতে হিতে বিপরীতই হয়েছে। রত্নেশ্বরের মনের গতি অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। রত্নেশ্বর আগের চেয়েও বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে প্রমীলার ওপর। ভাবছে, প্রমীলাও ওর ওপর খুব আকৃষ্ট। রত্নেশ্বরের অন্য অন্যায় কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আর একটা মস্তবড় অন্যায়ের দিকে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে।

প্রমীলা যদি নিজে 'বিবেকবুদ্ধি' ফিরে আসুক চিন্তা না করে, ঈশ্বর ওদের বিবেক-বুদ্ধি জাগিয়ে তুলুন বলত, তাহ'লে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হলেও হতে পারত। একটা কিছু ঘটে গেলে নানান চিন্তা খেলে মানুষের মনের মধ্যে। প্রমীলারও খেলাটা অস্বাভাবিক নয়।

অস্বাভাবিক হ'ক আর স্বাভাবিকই হ'ক এসব চিন্তা নিয়ে থাকলে চলবে না প্রমীলার। আর একটা অনর্থ যাতে না ঘটে, তার জন্য বাস্তবের কুরুক্ষেত্রে নামতে হবে তাকে।

কর্তব্য দায়িত্ব এই দুটো শক্ত লোহার শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প্রমীলা। আর বাঁধা থাকতে চায় না। শেকল ভেঙে টুকরো টুকরো করে মুক্তি পেতে হবে এবার।

নিশুতি রাত নিথর নিঝুম।

বিছানায় ছেলের শিয়রে বসে আছে প্রমীলা। ভেতরে চিন্তার তোলপাড় চলছিল এতক্ষণ। খটাস শব্দে সচেতন হয়ে উঠল।

দরজার কড়ায় হাত পড়েছে কার। জানলা খুলে দেখল। রত্নেশ্বর। অমলের বুকের চাদর খুলে গেছে ঘুমের ঘোরে। গলার কাছ বরাবর টেনে দিল। এই বিছনায় শুত শ্যামসুন্দর। অশৌচ যাওয়ার পর মাসখানেক হল শুচ্ছে অমল।

মেয়ের পাশে শোয় প্রমীলা। এ তক্তপোষ থেকে বসে বসেই দেখল বুলবুলকে। নামল। খিল খুলল সন্তর্পণে।

বেরিয়ে দেখে রত্নেশ্বর নেই। নিজের ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি এঘরের দিকে।

প্রমীলা এলো।

দু'কথা শুনিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ছিল। যাওয়াটা উচিত হয়নি। সে তো নিজেই আসে একবার ক'রে। শোনাতে হ'ল না। রত্নেশ্বরই বলল, মনটা অস্থির অস্থির করছিল বড্ড।

সারাদিনের মধ্যে অনেকবারই তো দেখা হয়, তবু অস্থির ?

এমন অভ্যেস হয়ে গেছে—ঘুম হয় না।

ঘুমোও।

ভেতরে ঢোকেনি পর্যন্ত। দোড়গোড়া থেকে ফিরে এসেছে প্রমীলা।

ঘুমোতে চেষ্টা করছে। ঘুম আসছে না। চোখ বুজে এমনিই পড়ে রয়েছে। খানিক পরে তক্তপোষটা নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে নামল বুলবুল। দেখছে প্রমীলা। রত্নেশ্বরের ঘরে ও যাবে নাকি!

যা ভেবেছিল, তাই হ'ল। রত্নেশ্বরের ঘরে গেল। পা টিপে টিপে গেছে প্রমীলা। দরজা খোলা। বুলবুল বলছে, ওষুধ একটু বেশী করে খাইয়ে দাও। ঘুম হ'চ্ছে না।

কম খাইয়েছিলুম বলে তো এসেছিস।

নইলে কি আর আসি না? শোবার আগে ওষুধ খেয়ে যাইনা তোমার কথা মতো? দাদাকে তুমি এমন ওষুধ দাও—গাধার মত ঘুমোয়। যত দুষ্টুমি আমার বেলায়। দাও না তাড়াতাড়ি। মা উঠে পড়বে আবার। মা ওষুধবিষুধ পছন্দ করে না একদম।

ওষুধ গেলার ঢকঢক আওয়াজ হচ্ছে। এবার বেরুবে বুলবুল। ঘরে ঢুকে হাত থেকে শিশিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত প্রমীলা। করল না। নিজেকে সামলে নিয়ে চলে এলো। প্রমীলা জানতে পেরেছে জানলে, একটা কিছু কাণ্ড করে বসতে পারে রত্নেশ্বর। ছেলেমেয়ে দুটোর প্রাণ নিয়ে টানাটানি হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

প্রমীলার প্রধান কাজ হবে ছেলেমেয়ে দুটোকে রত্নেশ্বরের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা। রত্নেশ্বরের স্থান নেই আর এ বাড়িতে। ঢের হয়েছে, আর নয়। নিজেকে মুক্তি পেতে হবে ওর কাছ থেকে। সময় অনেক চলে গেছে। অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে। আরো হতে বসেছে। বিষধরকে অমৃতধর করতে চেয়েছিল। ভুল। হবার নয়, তার সাধ্যের বাইরে। কালই শেষ ফয়সালা করে ফেলবে প্রমীলা রত্নেশ্বরের সঙ্গে।

রত্নেশ্বরকে ঘিরে যা কিছু গড়ে উঠতে চেয়েছিল। আশার ভিত গেড়ে গেড়ে সে ভিত ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। যতবার সব ভোলার জন্য চোখ বুজতে চেষ্টা করছে, ততবার জবার মুখ ভেসে উঠছে। আসার সময়ের সেই করুণ মুখ সেই সজল চোখ। সেই কান্না ভেজা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে—·····মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক।

মাস্তুরাগাঁয়ে বৌ হয়ে এসেছিল দু'জনে একই দিনে। দুটো ঘর তফাতে ওদের ডেরা। পুকুরে চান করতে গিয়ে প্রথম পরিচয় দু'জনের। তারপর এবাড়ি ওবাড়ি আসাযাওয়া ঘনিষ্ঠতা। পুকুরের জলেই দাঁড়িয়ে মকর পাতানো।

জবা দিদি বলত প্রমীলাকে। দু'বছরের বড় বলে। এ ডাকটা অবশ্য পোষাকী। লোকজনের মাঝখানে। এছাড়া কখনো মকরদি। কখনো তুমি, কখনো তুই—যখন যেমন খুশি। মোতিনগরে না আসা পর্যন্ত বছর সাতেক গাঁয়ে ছিল প্রমীলা। এই সাত বছরে যেন সাত জন্মের আপন হয়ে উঠেছিল জবা। প্রতি দুপুরে জবা এসেছে, এক দুপুর বাদ গেলে, একটা যুগ বাদ গেছে যেন।

প্রমীলা সকলের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায়। জবার কাছ থেকেও। এ রাত্তিরে কি জবা ছাড়বে না তাকে! ভুলতে চাইছে, মুখখানাকে সরাতে চাইছে, মন কাঁদানো ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছে। পারছে না, নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

দুঃস্বপ্ন দেখা রাতের মতো রাত কাটল প্রমীলার না ঘুমিয়ে।

ভোর হতে শুরু করেছে। চড়ুইয়ের কিচিরমিচির শব্দ-আঙিনায়। রত্নেশ্বরের দরজায় টোকা মারল প্রমীলা। এক দুই তিন—চতুর্থ টোকায় দরজা খুলল রত্নেশ্বর। —বৌদি!

হ্যাঁ! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। হাসতে হাসতেই বলেছে প্রমীলা। জানিয়েছে, নিভৃতে একলা পেতে চায় সে রত্নেশ্বরকে। একচক্কর ঘুরে এলো চতুর্দিকে প্রমীলার দু'চোখ। মুখ টিপে হাসছে প্রমীলা।

একটা অনাস্বাদিত আনন্দ ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল রত্নেশ্বরের ভেতরে। ঠিক হ'ল, ঠিক করল প্রমীলা নিজেই—বিকেলে ভুবনপাহাড়ের গুহায় দু'জনের দেখা হ'বে।

....গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গের পাশে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। প্রমীলা আর রত্নেশ্বর। যে আনন্দ নিয়ে রত্নেশ্বর এসেছিল, সে আনন্দ গুহার পাথরের তলায় পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। কামনার আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একদম নিভে গেল। প্রমীলার ভয়ংকরী মূর্তির কাছে সে নিস্তেজ অসহায় শিশু পঙ্গু।

কিছুক্ষণ আগে যাকে ভাবা গেছল, অতি দুর্বল নিরুপায়—তার আশ্রিত হতে চায়, তাকে আত্মসমর্পণ করে আত্মতৃপ্তি পেতে চায় —সেই প্রমীলাকে মনে হচ্ছে সমস্ত পুরুষের শক্তি ধরে ও একা। ওর চোখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না। পায়ের তলায় পাথরটাও কাঁপছে

যেন, সরছে বুঝি। পা টলছে, মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়ে আসছে।

ওষ্ঠাগত প্রাণ। এ রণংদেহি মূর্তির কাছ থেকে কি জ্যান্ত থাকতে মুক্তি পাবে না রত্নেশ্বর?

হাতের পোড়া কাঠটা তেমনিই ধরে আছে প্রমীলা। তেমনিই অপলকে দেখছে রত্নেশ্বরকে। যে ভালো হ'তে চায় না কিছুতেই, খারাপ হব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তার কাছে অপরের শুভ-ইচ্ছের কোন দাম নেই। ফিরে আসে বিমুখ হয়ে।

শোওয়ার আগে, রাতে—গেছে প্রমীলা রত্নেশ্বরের ঘরে। ওর জঘন্য স্বভাব! কোন মেয়েকে আটকে রেখেছে কিনা কে জানে। দেখে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। এই যাওয়া নিয়েই শ্যামসুন্দরের মনে অশান্তির তুঁষ ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে। পরে প্রমীলার চিন্তায়—বিবেকবুদ্ধি ফিরে আসুক—বিরাট আগুন জ্বলে উঠছে। সে আগুনে নিঃশেষ হয়ে গেছে মানুষটা অকালে।

এই রত্নেশ্বর-অজগর এর জন্য দায়ী। পেটে পুরেছে শ্যামসুন্দরকে। পেটে পোরার জন্য তাক খুঁজছে অমল-বুলবুলকে। কোন ক্ষমা নেই, কোন করুণা নয়। খুনীর খুন হওয়াটাই প্রাপ্য।

কাঠটা উঁচিয়েছে প্রমীলা। বসিয়ে দেবে সজোরে মাথায়। তারপর পাথর ছুঁড়ে মারবে। দৌড়ে পালাতে গেলেও পড়বে পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে একদম নীচে। প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকবে শ্যামসুন্দরের মতো।

রত্নেশ্বরকে আসতে বলেছিল প্রমীলা অনেক কথা বুঝিয়ে বলার জন্য। এজায়গায় আনার আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। বন্ধুর স্মৃতি জেগে উঠবে। পাহাড়ের তলায় এলে মনটা কেঁদে উঠবে শ্যামসুন্দরের জন্য। বাউণ্ডুলে রত্নেশ্বরকে ঘরবাসী করার জন্য ধনী করে তোলার জন্য, মেয়েদের ওপর থেকে নজর ঘুরিয়ে চরিত্র শোধরানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে শ্যামসুন্দরই। বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সকলেই

বংশের কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চায়নি। এগুলো অন্তত মনে পড়বে। আর মনে পড়বে—শ্যামসুন্দরের মন জ্বলেছে ওকে নিয়ে শেষের দিকটায় প্রমীলাকে ভুল বুঝে --তবুও ওকে একদিনের জন্য একটা কটু কথা অবধি বলেনি। নীরবে গোপনে নিঃশেষ হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।

প্রমীলা মনে করেছিল, এখানে এলে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এইসব আলোচনাই করবে রত্নেশ্বর। রত্নেশ্বরকে বুঝিয়ে দেশে চলে যেতে বলবে প্রমীলা। জানিয়ে দেবে প্রমীলার আর তাকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা নেই। নানা কারণে তার ওপর বহুলোক ক্ষেপে আছে। মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে বলে তো অনেকেরই মাথায় রক্ত চড়ে আছে। সুযোগ সুবিধে খুঁজছে ওরা। তার ওপর শ্যামসুন্দর নেই যে, সামলাবে! প্রমীলা একলা। এ অবস্থায় এখানে থাকার আর কোন মানে হয় না রত্নেশ্বরের।

প্রমীলার আশা ছিল তার এ ওষুধে রুগীর ব্যামো সারবে। সারা দূরের কথা, বাড়ল আরো। শ্যামসুন্দরের জায়গাটা দেখে, মনে মনে কোন প্রতিক্রিয়াই হ'ল না। বরং শ্যামসুন্দরের স্ত্রীকেই অন্য চোখে দেখতে শুরু করে দিল--অভিসারিকা সঙ্গিনী।

আঘাত হানবে বলে এগোতে যাচ্ছে প্রমীলা, মনে হল, জবা যেন এসে পা দু'টো জড়িয়ে ধরল। থমকে গেল। জবা জ্বালাচ্ছে এখানেও। আসার সময়কার কথা শুনতে পাচ্ছে প্রমীলা আবার নতুন করে।

—ওকে দেখিস রে। ও আমার মুখ দ্যাখে না, তবু স্বামী তো! মানুষের মত মানুষ যাতে হয়। ফিরে এসে যেন সবার আদরের হয়।

কথা দিয়েছে প্রমীলা, দেখবে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ফেরাতে। বাড়ি যেতেও বলেছে কত। সমস্ত ব্যর্থ। জবা বলেছিল, রত্নেশ্বরকে ফেরানোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে প্রমীলার। হ'ল কই?

মনে পড়েছে, বিকেলে চুল বাঁধার পর দুজনে দু'জনের সিঁথিতে

টকটকে লাল সিঁদুর পরিয়ে দিত। পরানোর সময় জবা বলতো, মকর! এয়ো-স্ত্রী হয়ে থাকিস জন্ম জন্ম। জবারই কথার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে আসত প্রমীলার মুখ দিয়ে। এয়ো-স্ত্রী হয়ে থাকিস জন্ম-জন্ম।

সম্বিত ফিরে পেল প্রমীলা। উত্তেজনা কমছে। সিঁথির সিঁদুর মুছেছে নিজের। অঙ্গে উঠেছে থান-ধুতি। ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছে। একি করতে যাচ্ছিল সে? জবাকে—মকরকে—ছোট বোনকে নিজের মতো! না, দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না এখন। ওকে ফেরাতে হবে। যে কোন উপায়েই হ'ক, যে কোন উপায়ে—

এগোচ্ছে প্রমীলা। যতখানি সম্ভব মুখে চোখে রাগের ভাবটা ফুটিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। ভয় পাক ও। ভয়ে এখান থেকে দেশে চলে যায় যদি—উদ্দেশ্য সফল হবে প্রমীলার।

তোমার জীবন আমার হাতে। কৃত্রিম ক্রোধ ফেটে পড়ছে প্রমীলার গলায়।

বলির পাঁঠার মত ঠকঠক ক'রে কাঁপছে রত্নেশ্বর।

এখানে যদি থাকো—বেঁচে থাকতে হবে না আর। আমি নিজে হাতে খুন করবো তোমায়। অমলের বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী তুমি। কোন দয়ামায়া নেই আমার তোমার ওপর। সুযোগ দিলুম বাঁচার। যে পথ ইচ্ছে বেছে নাও।

কিছু বুঝে উঠতে পারছে না রত্নেশ্বর। সত্যিই প্রমীলা কি সুযোগ দিচ্ছে বাঁচার?

দাঁড়িয়ে আছে দেখে, ধমকে উঠল প্রমীলা।—যাবে কি না? যেতে যদি চাও তো এখুনি চলে যেতে হবে তোমায়।

আস্তে আস্তে পেছন ফিরল রত্নেশ্বর। পায়ে পায়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো।

কাঠটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাথরের শিবকে জড়িয়ে ধরল প্রমীলা। পাথরে জবার মুখই দেখছে। জবার সিঁথির সিঁদুর আরো উজ্জ্বল আরো টকটকে লাল।

*   *   *   *

গুহা থেকে বেড়িয়ে আসছিলুম আমি। কেন জানিনা, হঠাৎ ফিরে যেতে ইচ্ছে করল আবার ভেতরে। যেখানে পাথরের শিব রয়েছে।

গেলুম আমি।

জড়িয়ে ধরলুম শিবকে বুক ভরা প্রশান্তি নিয়ে।

॥ চার ॥

থুরথুরে বুড়ো ঝুমন লাঠি ঠক্ঠক্ করে নিয়ে এলো আমায়।

শিওনীর এ জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা।

গাছগাছড়া যে নেই, তা নয়। আছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

কাঁপা গলায় বললো ঝুমন, তীরের ফলাটার দিকেই মোতিয়ারীর চোখ-মন আটকে গেছল একদম।

নরম রোদ্দুরে তীরের ফলার রঙটা যেন বদলে গেল। নীল। একেবারে ঘন নীল। এক ঝলক মৃত্যুবিষ টল টল করছে ফলাটায়। তীরটা বাতাসের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে ছুটে আসবে এই দিকে যে কোন মুহূর্ত্তে। যুবকটি দূরে দাঁড়িয়ে তাক করছে ধনুক হাতে নিয়ে। সুযোগ খুঁজছে তীর ছোঁড়ার। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলে, কি যে হয়ে যাবে মুহূর্তে, সে-টা ভেবেই দম বন্ধ হয়ে আসছে মোতিয়ারীর।

খোলামেলা জায়গা। ঠাণ্ডা-মিষ্টি হাওয়ার ঝাপটা লাগছে মুখে চোখে কপালে কানে। তবু একটা অস্থির আগুন গা বেয়ে ওপর দিকে উঠছে যেন। উঠল। মোতিয়ারীর নিজের মাথাটা বুঝি নিজের নয়। মাথার ভেতর আগুনের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। রুদ্ধনিশ্বাসে যে দৃশ্য দেখছে, তাতে হবারই কথা। বুকটা ভয়ে দুর দুর করছে। ছোঁড়াটা যেভাবে তাকাচ্ছে, তীরটা হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে এসে তার বুকেই।

পালাতে ইচ্ছে করলেও, উঠে পালবার উপায় নেই। চতুর্দিকে শুধু কালো আর সাদা চুলের মাথা। লোকে-লোকারণ্য। এতগুলো

লোক বোকার মতো কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে আছে। মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই কারো। একটা নিরীহ মেয়ে খুন হতে বসেছে, শেষ হতে বসেছে—সেদিকে কোন ভাবনাচিন্তাই নেই। কষ্টিপাথরের ছোঁড়াটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার হিম্মতও নেই।

সরাই-মঙ্গরোহিগাছগুলোয় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক'টা মেয়ে। ওদেরও দু'চোখ এদিকে। অপলকে দেখছে। বুকের মাঝখানটা বড্ড বেশী ওঠানামা করছে ওদের। প্রেম ক'রে প্রাণ খোওয়াবে একটা মেয়ে—এটা ওরাও চাইছে না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, নিয়তির ফের—প্রেমিকার হাতে প্রেমিকের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার তৎপরতা চলছে। প্রাণ নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি, সেখানেও নির্মম মজা দেখার জন্য উৎসুখ এতগুলো মানুষ। কৌতূহলী মন নিয়ে, এক দুই তিন ক'রে ক্ষণ গুণে চলেছে মরণ-খেলার যবনিকা পড়ার অপেক্ষায়।

মোতিয়ারীর বুকের বাঁদিকটা চিন চিন করছে থেকে থেকে। সময় সময় মনে হচ্ছে, সে একেবারে নিথরনিস্পন্দ হয়ে গেছে। একটা মাটির পুতুল দাঁড়িয়ে আছে যেন। পাথরের হলে ভালো হত, তীরটা বিঁধতে পারত না। বুকটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে ফেলতে পারত না। কিন্তু তা হবার নয়। তীর বিঁধবে মাটির বুকে। বুকখানা ভেঙে খান খান হয়ে, ঠিকরে ছিটকে পড়বে এদিক-ওদিক।

বুক মোচড়ানো নিশ্বাস পড়ল মোতিয়ারীর। আর সঙ্গে সঙ্গে কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝে উঠতে পারা গেল না। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে দু'হাতে বাঁদিকের বুক চেপে লাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বেহুঁশ। অদূরে দাঁড়িয়েছিল বাবা। ছুটে এলো! এলো আরো অনেকে—আদিবাসী হলেও পরগোত্রের লোক—আগারিয়ারা। এলো নিজেদের জাতের মুরিয়া জাতবেরাদাররা।

লেংটিপরা যোগীনাথের নির্দেশে তীরন্দাজ যুবকটি মঙ্গরোহি-

গাছের ডাল কেটে নিয়ে এলো। ডাল হাঁতে নিয়ে, মোতিয়ারীর মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিল যোগীনাথ বার তিনেক। তারপর ডালের সরু দিকটা মাথায় বুকে পায়ে ছোঁয়াতে লাগল। একবার পায়ের দিক থেকে, একবার মাথার দিক থেকে। মাথার দিক থেকে তিনবার আর পায়ের দিক থেকে তিনবার—মোটমাট ছ'বার এই রকম ক'রে ডালটা পশ্চিম দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল যোগীনাথ।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল মোতিয়ারী। উঠে বসল। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে হতচকিত। ত্ব'হাতে ত্ব'চোখ রগড়ে নিল। দেখল আবার। তারপর বিড়বিড় ক'রে বলল, দিনের বেলায় একি ত্বঃস্বপ্ন। জেগে জেগে এরকম স্বপ্ন কি কেউ কখনো ছাখে, না দেখেছে ?

ছাখে, দেখেছে। যোগীনাথের দৃঢ়কণ্ঠের উত্তর।—আমি দেখেছি, দেখছি, দেখবোও।

বিস্ময়বিমূঢ় মোতিয়ারী। নির্বাক মুখে চেয়ে চেয়ে দেখল কেবল যোগীনাথের মুখখানা। ওই টানা টানা ডাগর চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছে। ও যুগল চোখের যুগল তারা একসঙ্গে একই কথা কয়ে উঠছে নিঃশব্দে।—এখানে আসার পর থেকে কি তুই যাসনি অশথতলায় ? গেছিস কতবার তোর বাবার সঙ্গে। আমার ইঙ্গিতে ধুনির আগুনে কাঠ গুঁজে দিয়েছিস। নিভতে দিস্‌নি। তোর সামনেই তো গাঁয়ের লোকের অনেক কথাই হতো। ওদের অতীত ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে। ভেসে উঠত বর্তমান। ভেসে উঠেছে ভবিষ্যৎ। যেখানে সাবধান হবার প্রয়োজন, সাবধান হ'তে বলেছি। যেখানে এগিয়ে গেলে মঙ্গল, এগোতে বলেছি। কারো কোন ব্যাপারটা অমিল হতে তো দেখিসনি !

যোগীনাথ হাসছে মৃত্ব মৃত্ব।

যোগীনাথের ত্ব'পায়ে হাত ঠেকিয়ে নিজের কপালে ঠেকাল মোতিয়ারী।

এরপর আর একদণ্ড মরণ-খেলার জায়গায় থাকেনি। বাবাকে

নিয়ে যোগীনাথের সঙ্গে চলে এসেছে অশথতলায়। মাটির বেদির ওপর বসে বসে জানিয়েছে বেহুঁশ হয়ে পড়ার ব্যাপারটা। কি দেখেছে, কি ভেবেছে, তার অনুভূতির পরদায় কি ভাবের কি কি রেখা জ্বল জ্বল ক'রে ফুটে উঠেছে—সমস্ত।

সই শ্যামবতী আগারিয়াদের ঘরের মেয়ে। ওদের শ্রেণী আর তাদের শ্রেণী আলাদা। তা হোক তু'জনের ছোটবেলা থেকেই সই পাতানো রয়েছে। বড় মুখ ক'রে, ওর বিয়েতে আসতে বলেছিল মোতিয়ারীকে। এসেছে বাবার সঙ্গে।

ওদের বিয়েতে নিতকিত আচার-অনুষ্ঠান দেখছিল বেশ একমনে। শালগাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল শ্যামবতী। ওর মুখখানা হাসি হাসি। ওর কালো গলায় লাল পুঁতির টুকরো টুকরো আগুন জ্বলছে। মুখখানা লজ্জারাঙা। চাঁপারঙের শাড়িটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে পরা। শাড়ির আচল বুকের বাঁদিক দিয়ে উঠে পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে কোমরে। গাছকোমর বেঁধে আঁটসাট করেই শাড়িখানা পড়েছে শ্যামবতী। এলোচুল পাকিয়ে পাকিয়ে ডান কাঁধের কাছে ফাঁপানো চুলের ভেতর গুঁজে দিয়ে পরিপাটি ক'রে সেজেছে। বাঁহাতটা ওপর দিকে তুলে ধরেছে। আঙুলগুলো খোঁপায় ছোয়া।

দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা ভালোই লাগছিল মোতিয়ারীর। শ্যামবতীর স্বামী তুলারামের দিকে নজর পড়তে মাথাটা যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হল, শ্যামবতীর জায়গায় নিজেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর শ্যামবতীর স্বামী তারই বগলের তলা দিয়ে তীরটাকে ছুঁড়ে পাঠাবার মতলব করছে পেছনের মাটির হরিণটার বুকে পিঠে গেঁথে বসাবার জন্য।

আতঙ্কে মোতিয়ারীর সর্বশরীরের রক্ত হিম হয়ে এসেছে। বারবার মনে হয়েছে, তীরটার লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। হবে হয়তো। হবে কেন—হ'লই যেন। তুলারামের তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকের বুকটায় যেন সজোরে বিঁধে গেল। মৃত্যুর কি অসহ্য

যন্ত্রণা অনুভব করল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তারপর আর কিচ্ছু জানেনা। জ্ঞান হতে চোখ মেলে দেখেছে একজোড়া স্নেহভরা চোখ। সে চোখ যোগীনাথের?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল যোগীনাথ। কিছু বলতে চায়নি প্রথমে। বাবার অনেক ধরাধরি করার পর একটা কথাই বলেছিল স্রেফ—ও নিজেই বুঝতে পারবে'খন একদিন। এর বেশী বলতে পারবোনা আমি। এবিষয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবিনা আমায়। জিজ্ঞেস্ করার সুযোগ দেয়নিও যোগীনাথ। উঠে চলে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে, বসে বসে ভেবেছে মোতিয়ারী—কি বুঝতে পারবে সে একদিন।

মোতিয়ারীর আসল নাম সোয়াসিন। বাপের দেওয়া আদরের নাম। আর বন্ধুবান্ধবীদের সোহাগের নাম মোতিয়ারী। সোয়াসিন নামটা চাপা পড়তে লাগল দিনকেদিন সঙ্গিনী-সমবয়সীদের মোতিয়ারী নাম প্রচার করার দাপটে। ওদের মুখের জোরেই সোয়াসিন হারিয়ে গেল একদম। বাবার মুখ থেকেও। বাবাও ডাকতে শুরু ক'রে দিল মেয়েকে মোতিয়ারী বলে।

মোতিয়ারী।

ঊনিশ বছরের মেয়ে কিন্তু ঊনচল্লিশ বছরের ভারিক্কি চালচলন। ওর বয়সী মেয়েদের বিয়ের ঘটকালি করে ও একাই। তরুণ-তরুণীর পূর্বরাগের সেতু বেঁধে দেয় মোতিয়ারীই। মোতিয়ারী যে ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের যোগাযোগ ক'রে দেয়, সে ছেলের সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে নিশ্চিত। স্বয়ং ভগবান এসে দাঁড়ালেও সে বিয়ে ভাঙবেনা কিছুতেই। আসবেনা সে-বিয়েতে কোনদিক থেকে কোন বাধা-বিপত্তি। মোতিয়ারী পাত্র-পাত্রীকে দৃষ্টির নিরিখে বিচার ক'রেই নিরস্ত হয় না শুধু, বুদ্ধির দাঁড়িপাল্লায়ও ওজন ক'রে ক'রে দেখে দু'জনকে। তারপর মেয়ে-ছেলে—দু'জনের মেলামেশার সুযোগ-সুবিধে ক'রে দেয় নিজেই উদ্যোগী হয়ে!

গাঁওঘরের প্রত্যেকেই ওর বিচক্ষণ বুদ্ধির তারিফ করে। এই বয়সে এত বুদ্ধি এলো কোত্থেকে! এমেয়ে বাঁচলে বাঁচি, টিকলে হয়। যোগীনাথের কাছে প্রায়ই কথাটা তোলে বাবা। হাসে যোগীনাথ। বলে, এটা ওর একটা আলাদা শক্তি। এক একজন থাকে এরকম। সবার থাকে না।

সবার থাকে না কেন?

বলে বোঝানো মুশকিল। যে কথা বলবো, সেকথা তোরা বুঝবি না। এটাকে ষষ্ঠচেতনা বলেন অনেক জ্ঞানীগুণী। এ চেতনা মানুষের ভেতর থেকে কথা কয়ে ওঠে। জানিয়ে দেয় বিপদ; জানিয়ে দেয় সম্পদ। জানিয়ে দেয় ভালোমন্দ মানুষ। এমেয়ের ভেতর এইরকম একটা শক্তি আছে—যা ওকে জানিয়ে, বুঝিয়ে দেয়, জানিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে।

যোগীনাথ বহু দেশবিদেশ ঘুরেছে। অনেকের সঙ্গে মিশেছে। অনেক জেনেছে, অনেক শুনেছে, অনেক শিখেছে। শেষে মধ্যপ্রদেশের শিওনীতে এসে বসবাস করছে। ওর মত খণ্ডন করার মতো কোন শক্তি নেই শিওনীর কোন লোকের।

খালি মোতিয়ারীর বাবা কেন—মোতিয়ারীর বাবার মতন বেশীর ভাগ মানুষই যোগীনাথের মত অব্যর্থ বলে মেনে নিত। মোতিয়ারীর তো কথাই ওঠে না। মোতিয়ারীর ভেতর যখন কোন নতুন চিন্তা জেগে উঠেছে, তখুনি ছুটে এসে হাজির হয়েছে যোগীনাথের কাছে। সে রাতেই হোক কি দিনেই হোক। নিরালায় শলাপরামর্শ ক'রে যোগীনাথের আদেশ-উপদেশ শিরোধার্য ক'রে কাজে এগিয়ে পড়ত। প্রজাপতির নির্বন্ধন ঘটানোর কাজে।

গ্রামের মোতিয়ারী-ঘোটুলে প্রথম এসেছিল মোতিয়ারী খেলাচ্ছলে। সঙ্গীদের নিয়ে নাচ দেখার জন্য, গান শোনার জন্য।

খুব ভালো লেগেছিল। রোজ সন্ধ্যেয় আসতে লাগল দলবল নিয়ে। শেখার একটা পাগলা নেশা মাথায় চেপে বসেছে। ছাড়ছিড়েন নেই।

গান-নাচ শিখতে শুরু ক'রে দিল মোতিয়ারী। মুরিয়া আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে নাচেগানে পারদর্শিনী হয়ে উঠল অল্পদিনের মধ্যে। ঘোটুলের অভিসারিকাদের প্রেমনিবেদন ঘরের নেত্রী—ঝালিইয়ারু একদিন ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ঘরের নামেই নামকরণ ক'রে দেয়। মোতিয়ারী। বলে, তুই নিজেই তো একটি মোতিয়ারী। নাচ-গান শিখে, নাচগান শেখাতে আরম্ভ করে দিয়েছিস মেয়েদের। উপযুক্ত ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগও করিয়ে দিচ্ছিস।

ঝালিইয়ারুর মুখ থেকে অন্য মুখে, অন্য মুখ থেকে আর এক মুখে—এইভাবে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ওর গুণকাহিনী। দশ বছর বয়সেই ওর মোতিয়ারী নামের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

যে সকল প্রণয়ী বেছে দিতে পারে, সে কি নিজের প্রণয়ীকে ঠিকমতো বেছে নিতে পেরেছিল? পেরেছিল কি মোতিয়ারী তার প্রিয়তম ঝুমনকে নিজের ক'রে বরাবর ধরে রাখতে?

মোতিয়ারীর জীবনে এ এক বিচিত্র অধ্যায়। মোতিয়ারী রহস্যময়ী নারী হয়ে উঠেছিল সবার কাছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এই রহস্যময়ী নারীর অন্তরের রহস্যখানি আবিষ্কার করতে হিমশিম খেয়ে গেছে, পারেনি। যে ঝুমনকে ঘিরে চারিদিকে রহস্যজাল বিস্তার ক'রে চলেছিল মোতিয়ারী, সেই ঝুমনও ওর মনের তলায় নামবার চেষ্টা ক'রেও অন্য কিছু পায়নি। পেয়েছে নিজেকেই। ওর ভেতরে দেখেছে নিজের ভেতর। ওর চোখে দেখেছে নিজের চোখ, নিজের মুখ। ওর কণ্ঠে শুনেছে নিজের কণ্ঠ। সেই কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারণ হতে শুনেছে আশ্চর্যভাবে নিজেরই কানে। ঝুমন ঝুমন ঝুমন!

গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বলেছে মোতিয়ারী—ঝুমন রে, তুই আমার জীবন তুই আমার শয়ন স্বপন—

সব, সব কিছু। সকাল-দুপুর কাজে, তোকে ভুলতে পারিনা যে। নতুন হয়ে বাঁচি আমি, তোর কাছে এসে সাঁঝে। খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে মোতিয়ারী।

চিবুক ধরে মোতিয়ারীর মুখখানা নিজের দিকে টেনে আনে আরো ঝুমন। মুগ্ধচোখে দেখতে থাকে ওকে। পঞ্চদশী তরুণী মোতিয়ারীর মধ্যে পাঁচ বছর আগের কিশোরী মেয়েটাকেই দেখছে আবার।

সেদিন ঘোটুল-ঘরের মাটির দাওয়ায় শালকাঠের খুঁটিতে দেহ হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বসে নাচ দেখছিল ঝুমন। ক'দিনে বড়দের দেখে দেখে হুবহু অনুকরণ করেছে মোতিয়ারী। দু'হাত কোমরে দিয়ে ঢোলকের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার এগিয়ে আসছে। ঝুমনের মনে হচ্ছে, এগোবার সময় মেয়েটা তার দিকেই তাকাচ্ছে ঘন ঘন। নাচের ঢঙ এমন, যেন নাচতে নাচতে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাক খুঁজছে। মুচকে মুচকে হাসছে।

বেগতিক দেখে ঝুমন বসে বসে পিছু হটতে শুরু করেছে। ধূর্ত মেয়েটা ঝুমন পালাতে চেষ্টা করছে, বুঝতে পেরেছিল। বাপ রে, ভাসা ভাসা চোখের বড় বড় কাজল কালো তারা দুটোর কি সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চোখের পলকে লাফিয়ে এসে পড়ল একেবারে সামনে। সাদা ধবধবে সাজানো দাঁত বার ক'রে হাসছে। চোখ নাচিয়ে, ভুরু কাঁপিয়ে, সারা শরীর দুলিয়ে আধো আধো কথায় বলল, কি— এত ভীতু কেন তুই? তুই মরদ না? কথা কয়ছিস না কেন— বোবা নাকি?

হাতেনাতে ধরা পড়ে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছে। এতটুকু মেয়ে এমন ধারা জোরালো জানতে পারলে—এ আসরে কস্মিনকালেও আসত না ঝুমন। মুখ নীচু করেই উঠে দাঁড়াল। এ মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদ। মুখ যা

ছোটাচ্ছে, কোন কিছু বলতেও বাধবেনা আর। মেয়েটার হাত থেকে রেহাই পাবার, পালাবার পথ খুঁজছে। আড়চোখে দেখছে। এদিক ওদিক।

কি গো বাঁকা শ্যাম—পছন্দ হচ্ছে না নাকি? পালিয়ে আর যাবি কোথায় তুই? ছুটতে আমিও জানি—বুঝলি?

পনেরো বছরের কিশোর ঝুমনের কানের দু'পাশ লাল হয়ে উঠছে, গরম হয়ে উঠছে। কি বিড়ম্বনায় না পড়েছে সে। সে নিজেকে বিব্রতবোধও করছে খুব। চোখের পলকে যা ঘটে যেতে পারে, সেটা ভেবে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তার এ অবস্থা দেখে তখুনি মেয়ের দল এসে ঘিরে ধরবে তাকে। মুখরা মেয়েটার সঙ্গে হাসিমস্করায় যোগ দেবে ওরা। তারপর চলবে নিদারুণ অপমানের পালা। জনায় জনায় হেনস্তা করে মজা লুটবে তারা। ফাগুনের শুরু। বাতাসে শীতের ঠাণ্ডা আমেজ রয়েছে বেশ। কিন্তু ঝুমনের কপাল-ঘাড় ঘেমে উঠেছে তবুও।

আ-ম'লো! অত ঘামছিস কেন? বাঘ না ভালুক যে, গিলে খাবো! দূর হ' সুমুখ থেকে! দূর দূর! কি বেরসিক রে তুই! কোন দেশের মানুষ রে তুই! দূর দূর। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল মোতিয়ারী। ফিরেও তাকাল না আর ঝুমনের দিকে।........

সেই মোতিয়ারী। বলছে, তুই আমাব জীবন শয়ন স্বপন।....

পনেরো বছরের কিশোর নেই আর ঝুমন। যুবক এখন। সেও কথা শিখেছে অনেক। সরম গেছে। জিভের জড়তা গেছে। জিভের ডগায় এসে কথা থমকায় না আর। অনর্গল কথা বলে। অন্য কারো সঙ্গে নয়, বলে মোতিয়ারীর সঙ্গে। মঙ্গরোহিগাছের তলায় নিভৃতে বসে বসে। সে-সব আলাদা ব্যাপার। হৃদয় বিনিময় আর মন জানাজানির কথা। মোতিয়ারী বলেছে, দেখ ঝুমন, অনেক ভেবেচিন্তে দেখলুম আমায় শাদী ক'রে তুই সুখী হবিনা। তার চেয়ে ভবানীকে কর না! সে তো আমারই বন্ধু।

মাথার চুল ধরে নেড়ে দিয়ে ছদ্মকোপে গম্ভীর গলায় বলেছে ঝুমন, ফের যদি ওকথা বলিস তোকে আস্ত রাখবোনা। জ্যান্ত সমাধি দোব তোকে মাটিতে পু্তে।

এতে তো তোর সুবিধেই হবে। আমার সমাধির ওপর বসে বসে ফুর্তি করবি দু'জনে। তা হোক, তবু তো তুই সুখী হবি। এতেই আমি সুখী হব। সমাধির ভেতর থেকে আমার আত্মা গুন গুন ক'রে গাইবে। —সুখী হোস ক্ষতি নেই, আসিস যদি এখানে, সুখী হব, বসিস যদি সমাধির এ আসনে।

দু'কানে হাত চাপা দেয় ঝুমন। এসব অলক্ষুণে কথায় ঠাট্টা তামাশা ভালো লাগেনা তার মোটে। বলে, ফের যদি মুখে একথা শুনি, জিভ কেটে ফেলবো তোর।

জিভ কাট, জীবন কাট। কেটে টুকরো টুকরো কর আমায়। আপদের শাস্তি হোক তার।

ফের এসব কথা—। উঠে পড়ে ঝুমন। বলে, দেখবি কি করি আমি। কাল সকালে ঝুমড়ি থেকে বেরুলে পর—মজাটা টের পাবিখন। আর একতিল না দাঁড়িয়ে হনহনিয়ে চলতে থাকে। মোতিয়ারী দৌড়য় পেছু পেছু! চিৎকার ক'রে বলে, ওরে শোন কালোবরণ কানে কালা! আর বলবোনা কোন কথা।—দিব্যি করছি। তোর দিব্যি, আমার দিব্যি, তোর প্রেমের দিব্যি।

দাঁড়িয়ে পড়ে ঝুমন। হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে দাঁড়ায় মোতিয়ারী। চেয়ে থাকে দুচোখ মেলে। মৌন মুখ।

হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেছে ঝুমন আবার মঙ্গরোহিগাছের তলায়। এলোমেলো হাওয়ায় টুকরো টুকরো চুলগুলো মোতিয়ারীর ছোট্ট কপালটা ছেয়ে ফেলেছে। আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে হেসে ফেলল ঝুমন। বলল, আগের কথাটা মনে পড়েছে বুঝি? অত ঘাবড়ে গেছিস কেন? একদম চুপচাপ! তখন তো অতশত বুঝতুম না। গোঁয়ার গোবিন্দ ছিলুম। তুই যে

ঠাট্টা করে বললি, অন্যের সঙ্গে প্রেম করছিস আমাকে বিয়ে করবি না—সত্যি ভেবে নিয়ে খুব আঘাত পেয়েছিলুম। তুই ছাড়া জীবনের কোন মূল্য নেই-ই আমার। তাই বিষমাখানো তীরের ফলাটা নিজে হাতে নিজের বুকে বেঁধাতে চেষ্টা করেছিলুম। তুই হাত ধরে আটকেছিলি। বলেছিলি, যদি মরতেই হয়, আমাকে শেষ ক'রে তবে—। নিজের বুক পেতে দিয়েছিলি আমার শক্ত মুঠোয় ধরা তীরের ফলাটার নিচে। সজাগ হয়ে উঠেছি আমি। হাতটা ঠক ঠক ক'রে কেঁপে উঠেছে। তাড়াতাড়ি তীরটা ছুঁড়ে ফলে দিয়েছি দূরে।

জোরে হেসে উঠেছে ঝুমন। পিঠে হাত চাপড়ে বলেছে, পাগলী কোথাকার। প্রতিজ্ঞা করিনি সে-সময়—তোর কোন কথায় রাগ ক'রে মরতে যাবো না আর? মরতেই যদি কোনদিন হয়—তোকে মেরে তবে মরবো। কারো জন্যে রেখে যাবো—সে বান্দা নই আমি। তোর মুখ বন্ধ করার জন্য ভয় দেখাচ্ছিলুম স্রেফ।

তাই নাকি? কানাইয়ের মতন ছলচাতুরী জানিস তো অনেক! যা যা! যা খুশি করগে যা! তোকে ধরছি না আর। দু'হাতে ঠেলে দিয়েছে ঝুমনকে মোতিয়ারী। তারপর গাছতলায় ধপাস ক'রে বসে পড়ে গান ধরেছে। গলা ছেড়ে গেয়েছে। —সই এ কেমন নাগর জ্বালাতে গিয়ে জ্বলি, অভিমান ভাঙো বলি, হাতেপায়ে ধরি, করি আদর।

তন্ময় হয়ে শুনছে ঝুমন। গানের সুরে সুরে নিজের সমস্ত সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে গানের মানুষের ভেতর নিজেকে।

সেই মোতিয়ারী সেই ঝুমন।

মোতিয়ারীর চোখের পলক পড়ছে না। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। এত দেখা এত জানা মানুষটাকে কি এমন দেখছে, কি এমন নতুন পেতে চেষ্টা করছে ঝুমনের মধ্যে—মোতিয়ারীই

জানে। জানেনা ঝুমন। ঝুমন এটুকু বোঝে যে, তার কাছে তার আগের মোতিয়ারীই আছে। তার প্রতিদিনের বেশীরভাগ সময়ের সেই সঙ্গিনীই আছে। খানিক আগে মোতিয়ারীর বলা কথা বাতাস ধরে রেখেছে। থেকে থেকে বলে যাচ্ছে ঝুমনকে বয়ে যাবার সময়। ....তুই জীবন....শয়ন, স্বপন....

সত্যিই তাই। ঝুমন মোতিয়ারীর জীবন....। ঝুমন ছাড়া এটা জানেনা কেউ। জানবার কথাও নয়। ঝুমনকে ছাড়ার গুজব মিথ্যে। মোতিয়ারী বিয়ে করতে পারেনা কোনমতেই শমরুকে। অসম্ভব। সূর্যের আলো নিভতে পারে একদিন, নক্ষত্র-গ্রহদের আলোও নিভতে পারে। কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব হবেনা কোন সময়--মোতিয়ারী-শমরুর বিয়ে।

রটনাটা সত্যি কিনা জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হলনা ঝুমনের। আগের মোতিয়ারীকেই যখন কাছে পেয়েছে সে, তখন আগের মতোই সহজ হয়ে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, অবাক হয়ে এত দেখছিস কি ?

কিচ্ছু না। আচ্ছা, এত লোকে এত কথা বলে আমার নামে, তোর মনে কোন দাগ কাটে না ?

আচমকা একটা ধাক্কা খেল ঝুমন। এ রকম প্রশ্ন শুনবে আশা করেনি। এতদিনের মেলামেশায় চিনতে পারলনা তাকে মোতিয়ারী —তবে ও কেমন মনের মানুষ ! চুপ ক'রে আছে। দেখছে।

উত্তর দিলিনি ?

এ মনে সহজে আঁচড় কাটতে পারবে না কেউ।

এইটাই শুনতে চেয়েছিলুম আমি। এই মনই তোর বেঁচে থাক চিরকাল। তুই বেঁচে থাকবি আমার মনে। আর আমি বেঁচে থাকবো তোর মনে। আমাদের দু'জনের এ বিশ্বাস যেন না ভাঙে কোনদিন। আর দাঁড়ায়নি, আর কোন কথা কয়নি। চলার পথে পা বাড়িয়েছে। যাবার সময় খোঁপায় গোঁজা ডাঁটি সুদ্ধ লাল-

নীল-হলুদ—তিনটে বুনো ফুল বার ক'রে নিয়ে ঝুমনের হাতে দিয়ে গেছে।

ঝুমনের মাথায় বাজ পড়লনা কেন? পড়লে ভালো হত। যা শুনল, এটা শোনার আগে মৃত্যু হলে ভালো হ'ত। হাতে সময় অনেক পেয়েছিল, কাজে লাগাতে পারলনা। আপসোসের অন্ত নেই। শেষ ক'রে শেষ হ'লে ভালো হ'ত। এখন মরেও শান্তি হবেনা। মায়াবিনীর মায়ায় পড়ে—চোখের দিকে চাইলে সব ভুল হয়ে যেত। শোনা কথা দেখা ব্যাপার বিশ্বাস করতে পারেনি ঝুমন। মোতিয়ারী ওর মোহিনী শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তাকে। ও যে শীগগির তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে—মনের কোণে উঁকি মারেনি এ ভাবনাটা এক মুহূর্তের জন্যও। যেটা ভাবেনি, সেইটাই ঘটল। শমরুকে বিয়ে করেছে মোতিয়ারী!

মোতিয়ারীর মৃত্যু হয়ে গেছে ঝুমনের দুনিয়ায়। মরা মানুষটার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তবু সমাজের এমনই রীতি—দেখা করতেই হবে। তা আবার একা একা নয়। সমাজের সমস্ত লোকের সামনে। কথাও কইতে হবে। বলতে হবে—মোতিয়ারীর বিয়ে হয়ে গেছে যখন, তখন দু'জনের পূর্বের সম্বন্ধ ঘুচে গেছে। অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ রইলনা আর। এখন থেকে দু'জনের ভাই-বোন সম্পর্ক। এই মধুর সম্পর্কটাই বজায় রাখবে তারা। আগের জের টেনে আক্রোশের বশে কেউ কারো দুশমনি করতে চেষ্টা করবে না কখনো। ভাবনাচিন্তায়ও না।

রোদ্দুরে রোদ্দুরে সবুজ ঘাস হলদেটে হয়ে গেছে। ময়দানের সেই মরা ঘাসের ওপরই পা রেখে মাথা নিচু করে বলেছিল ঝুমন—মোতিয়ারী আমার বোন। গোটা মাঠটা উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। ঝুমনের সামনে থেকে শুরু হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল হাততালির

আওয়াজ মাঠময়। প্রথম হাততালিটা শুরু হয়েছিল মোতিয়ারীর দিক থেকেই। ঝুমনের মনে হয়েছে কব্জি দু'টো ধরে মুচড়ে ভেঙে দেয়। হাততালির আওয়াজের রেশ এখনো কানে বাজছে ঘুরে ফিরে। রেশটায় ছেদ পড়ল হঠাৎ। যা শুনল, তাতে মাথায় রক্ত চড়ারই কথা। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। একটা কিছু কাণ্ড করে না বসে। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে তাহ'লে। নিজেকে সংযত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে ভেতরে ভেতরে। ঝুমন মুখ বন্ধ করে রাখলে কি হবে—অপর পক্ষ মুখর। কাটা ঘায়ে মুঠো মুঠো নুন ছড়াতে না পারলে, পুরোমাত্রায় তৃপ্তি পাবে না বুঝি ও। রাক্ষুসীর মতন হাসছে আবার। ভাবছে, কত না সুন্দর দেখাচ্ছে। শয়তানীর এরকম বেহায়াপনা সাজে। কথাগুলো আগুন ছড়াচ্ছে।

চাপা গলায় বলছে মোতিয়ারী।—অমন গোমড়ামুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এই সম্পর্কটাই তো ভালো। কত শুদ্ধ ভালবাসা। আমার কাছে তুই অনেক—অনেক বড় হয়ে থাকবি সারাজীবন ধরে। তোর চোখে তোর মনে আমিও অনেক বড় হয়ে উঠবো। একবারে আকাশছোঁয়া। জোরে হাততালি দিয়ে বলে উঠল মোতিয়ারী, ঝুমন আমার ভাই। নিজের ভাই বলেই মনে করবো ওকে আজ থেকে। হাততালিতে দুলে উঠল মাঠটা আবার। এবারে দুলতে লাগল বেশ জোরে জোরে—বহুক্ষণ অবধি।

দাঁতে দাঁত চেপে মরা ঘাস থেঁতলাচ্ছে ঝুমন দুপায়ে ক'রে। মোতিয়ারীর হাড়পাঁজরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে থেঁতলাচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে প্রাণটাকে বার ক'রে নেবে এখুনি।

ভিড় ফিকে হয়ে আসছে। চলে যাচ্ছে সব। চলে গেল মোতিয়ারীও শমরুর হাত ধরে। মাঠ ফাঁকা। একলা দাঁড়িয়ে আছে ঝুমন। বসে পড়ল। গালে হাত দিয়ে ভাবছে। এইভাবে

হাত ধরাধরি করে হু'জনে বেড়িয়েছে এই মাঠে অনেকদিন। তখন ভাবেনি, তার হাত ছেড়ে শমরুর হাত ধরবে মোতিয়ারী একসময়। শমরুও ভাবতে পারছেনা। না পারলেও, ছলনাময়ী ওকেও রেহাই দেবেনা নিশ্চয়। সেদিনের প্রতীক্ষায় বসে থাকবে ঝুমন। একটা জাত সাপ ফোঁস ফোঁস করে উঠল যেন নিশ্বাসে। বুকের স্পন্দনটায় যেন মাথা নাড়ছে—এপাশ-ওপাশ।

ধর্মভাই-বোনের সম্বন্ধ পাতানোর পর যে মোতিয়ারীর সঙ্গে ঝুমনের আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তা নয়, হয়েছে। বহুবার হয়েছে। পুকুরপাড়ে, পথে-মাঠে, ক্ষেতখামারে। দেখে কাছে আসেনি ঝুমন। দূর থেকেই হেসেছে। হাসিতে একটা ক্রুর দৈত্যকে উঁকি মেরে আত্মগোপন করতে দেখেছে মোতিয়ারী। লোকটার হু'পাশের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে ঠেলে উঠতে দেখেছে। দেখেছে সরে পড়ার জন্য লোকটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠছে। টুপির মতো সাদা কাপড়ের চ্যাপ্টা পাগড়িটা ঝাঁকড়া চুলে চেপে বসিয়ে দিচ্ছে ব্রহ্মতালুতে চাঁটি মেরে মেরে। রূপোর বালা-তাগা হু'হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। মালকোঁচা মারা ধুতিটা জাঙিয়ার মতো ক'রে আরো ওপর দিকে টেনে তুলে দিয়েছে খানিকটা। যেন নিজেকে নিয়েই ভীষণ ব্যস্ত। মোতিয়ারীর ওপর তেমন লক্ষ্যই নেই। মোতিয়ারীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা। ও কোথাকার কে!

লোকটা নতুন সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। তারই প্রতিক্রিয়া বাইরে। ভেতরটায় আপোস করেনি। ঠাণ্ডা করে রাখেনি। আগুন জ্বেলে রেখেছে, তাই জ্বলছে। জ্বলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বোধহয় শেষে। রাগ করে একটা বিয়ে ক'রে ফেললে, এ ভয় হ'ত না। কিন্তু বিয়ে করল না। ভবানীর সঙ্গে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে মোতিয়ারী। করতে চায়নি। বলেছে বন্ধুবান্ধবকে,

সে শয়তান নয়। মোতিয়ারী শয়তানী। তার যা সাজে ঝুমনের তা সাজে না।

মোতিয়ারীর ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠেছে। দাঁড়াতে পারেনি আর। ঝুমনের দিকে চাইতেও পারেনি। ছুটে পালিয়ে বেঁচেছে। পেছনে কষাঘাত করতে করতে ছুটে চলেছে অনেক দূর পর্যন্ত—হা হা শব্দের পৈশাচিক অট্টহাসি।

ডেরায় ফিরে এসে বাবার বুকে আছড়ে পড়েছে। তারপর শমরুর বুকে। হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়েছে শমরুর বুক আর নিজের বুক। কি হয়েছে—কারো কথার উত্তর দেয়নি। না শমরুকে না বাবাকে।

উত্তর দেবার কি-ই বা আছে মোতিয়ারীর ?

স্বেচ্ছায় পতিপদে বরণ করে নিয়েছে শমরুকে। বাবা রাজি ছিলনা। ছুতোয়নতায় শমরুকে বার ক'রে দিত চেয়েছিল ঘর থেকে। প্রথম প্রথম বাপের মতে মেয়ে খুশী হ'ত। কিন্তু পরে তাড়িয়ে দেবার কথা শুনলে ক্ষেপে উঠত। মারমুখী হয়ে উঠত। বোলত, শমরুর জন্যে আমি তোমায় ছাড়তেও রাজি। প্রাণ গেলে ছাড়বো না ওকে।

ঝুমনকে ছাড়তে পারবি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাটির দাওয়ায় পা ঠুকে ঠুকে নিজের আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছে মোতিয়ারী।

ওর কষ্টে তোর কষ্ট হবে না ?

না। কষ্ট হোক না হোক, সে আমি বুঝবো। তোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

এখনও সময় আছে, ভেবে ছাখ, বুঝে ছাখ! শমরুর চালচুলো নেই। চিরজন্ম ঘরজামাই হয়ে থাকবে। এটা সম্মানের ? তুই যে রকম মুখফোঁড় মেয়ে, কেনা গোলাম স্বামীকে বরদাস্ত করতে পারবি শেষ পর্যন্ত ? তাছাড়া আরো একটা মহাসমস্যা আছে।

বইগা-আগারিয়াদের ভেতর ঘরজামাই প্রথাটা চালু। আমাদের মুরিয়া সমাজের তেমন কোন নিয়ম নেই। যদিও সমাজের সকলে এ বিয়েতে মত দিচ্ছে। আমার মন সায় দিচ্ছেনা কিন্তু।

মোতিয়ারী বাদপ্রতিবাদ করলনা আর বাবার সঙ্গে। ফল হবে না কোন। বরং নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য বাবার দুর্বল জায়গায় মোক্ষম আঘাত হেনে মন ঘোরাতে হবে। মত করাতে হবে। এ ব্যাপারের কলাকৌশল জানা তার। অনেক বিষয়ে জয়ী হয়েছে। চোখের জলে? না! ও অস্ত্র প্রয়োগ করতে সরম লাগে তার। প্রয়োগ করবে মর্মছেঁড়া অস্ত্র।

হাতের বালা খুলেছে, তাগা খুলেছে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে বাবার পায়ের কাছে। নাকের নাকছাবি আর কানের ফুল খুলে ওই দশা করেছে। শালকাঠের খুঁটিতে হাত ঠুকে ঠুকে হলুদ কাঁচের চুড়ি ভেঙে চুরমার করেছে। দু'হাত রক্তারক্তি। বাবা কাছে এসে আটকেছে। চোখে হাত চাপা দিয়েছে। কাঁদেনি। কান্নার সুরে বলেছে, চোখের মাথা খেয়েছিস কি দেবতারা? মাকে নিয়েছিস, ভাইকে নিয়েছিস, বোনকে নিয়েছিস—আমাকে এইভাবে দগ্ধে দগ্ধে মরার জন্য রেখেছিস কেন? নিয়ে নে! নিয়ে নে! আমি আর বাঁচতে চাই না, চাই না—

দরদর করে চোখের জল ঝরেছে বাবার দু'গাল বেয়ে! বলেছে, ওরে ওকথাটা মুখে আনিস না আর দ্বিতীয়বার। শমরুকেই বিয়ে কর তুই। আমার আপত্তি নেই।

কেন বিয়ে করেছে শমরুকে সে মোতিয়ারীর চেয়ে আর কেউ ভালো জানেনা বোধ হয়। লোকে বলে অমন নিটোল গড়নে নিখুঁত মুখের মেয়েটা কি বোকা গো! এভাবে নিজের পায়ে কেউ কুড়ুল মারে নাকি! বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। মানাতো ঝুমনের সঙ্গে। ছ্যা-ছ্যা। শমরুটার সঙ্গে মানায়নি একদম। কি কদাকুৎসিত! মোতিয়ারীর প্রবৃত্তিকে বলিহারি যাই।

কেউ কেউ বলে আবার—যত নষ্টের গোড়া ওই বুড়ো বাপটা। একটা হাঘরেকে বাড়িতে পুষল সোমত্ত মেয়েকে সামনে রেখে। আহাম্মক ছোঁড়াটা বিয়ে করার লোভে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে খেটেছে। কিনা করেছে! রাতেদিনে না ঘুমিয়ে ঘর পাহারা, ক্ষেত পাহারা। গোরু মোষ দেখা, চাষবাস করা। এসব দেখে দেখে মেয়েটার মন গলেছে। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। কি করেই বা নিষ্ঠুর হয় খুব! বাপ তো চেয়েইছিল ছোঁড়াটাকে তাড়িয়ে দিতে। গ্রাম ছাড়া করতে। বাধ সাধল তো ওই পোড়ারমুখী মেয়েটাই। না সেধেই বা উপায় কি। যোগীনাথের সঙ্গে মিশে মিশে ধর্মকর্ম জ্ঞান হয়েছে। বাপের মতো বেইমানি করতে ওর মন চাইলনা। তাছাড়া সমাজের কাছে বাপের সম্মান ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে ধুলোয় মিশে যাবে—সেটাও রক্ষে করল ওই মেয়ে। সমাজের লোকের জ্ঞাতিদের শত্রু করে তোলেনি। সকলের মত মেনে নিয়েছে বিয়ে ক'রে। অর্থাৎ আত্মবলি দিয়ে।

সমাজের জ্ঞাতিদের কাছে বাবার সম্মান রাখার জন্যই যে বিয়ে করেছে মোতিয়ারী—এটা বেঠিক নয়। তবে আরো একটা কারণ ছিল। সে-কারণ শমরুর সজাগ দৃষ্টি।

দিনেই হোক রাতেই হোক গরমকালে আঁধির ঝড়ে একটা অজানা আনন্দের আমেজ অনুভব করত মোতিয়ারী। তাকে ঘর থেকে কে যেন টেনে বার ক'রে নিয়ে যেত মাঠেময়দানে। যে-সময় মানুষ ঘর ছেড়ে বেরোয় না প্রাণভয়ে। সে-সময় প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে ছুটোছুটি করবে মোতিয়ারী ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে।

মিহিমিহি লাল ধুলোয় আকাশের আলো ঢেকে গেছে। যেন লাল মেঘ ছেঁকে ধরেছে আকাশের সর্বাঙ্গ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। প্রতিটি গাছের পাতা একসঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একসঙ্গে শতসহস্র ঘুঙুর বেজে উঠছে ঝুনঝুন করে। কি মধুর মিষ্টি আওয়াজ! প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, মন জুড়িয়ে যাচ্ছে মোতিয়ারীর।

সবার অজ্ঞাতে বেরিয়ে গেছে মোতিয়ারী ঘর থেকে। নাচতে নাচতে কোথায় এসে গেছে,—মানুষখেকো পুকুরের ধার বরাবর—সে খেয়াল নেই। খেয়াল হ'ল, একটা অশথগাছ পড়ার মড়মড় আওয়াজের সঙ্গে কে যেন ওকে পেছন থেকে জাপটে ধরে, ওকে নিয়েই ছিটকে পড়ল দূরে। মাঠের দিকে। এরপর পাথরভারী মানুষটা মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল বজ্রকঠিন বাহুর বেষ্টনে মোতিয়ারীকে নিজের দেহের সঙ্গে বেঁধে রেখে। যতক্ষণ না ধুলোর ঝড় থেমে বৃষ্টি শুরু হ'ল, ততক্ষণ।

বৃষ্টি মাথায় ক'রে উঠেছে লোকটা। উঠেছে মোতিয়ারীকে নিয়েই। তারপর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে মৃদু হেসে বলেছে, এমন সময় কেউ বেরোয়? অন্যের ঝুপড়িতে আশ্রয় নিতে ছুটছিলুম আমি ওদিকে। গাছটার দুলুনি দেখে চমকাইনি। তোকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলুম। গাছটার পড়বো পড়বো অবস্থা। বুঝতে পারছি, তোর মাথায়ই পড়বে। আমি পরিষ্কার দেখলুম, দু'দিক থেকেই মৃত্যু আসছে তোর। ভুল করে যদি পুকুরের দিকে ছুটে যাস, তাহ'লেও অপঘাত মৃত্যু থেকে রেহাই নেই তোর। উপোসী ঝাঁঝিরা লম্বালম্বা হাত নিয়ে অপেক্ষা করছে জলের তলায়। তুই পড়লেই, তোর পা ধরে টেনে নিয়ে যাবে নিচে। জীবনে উঠতে দেবে না আর। আমি থাকতে পারলুম না দাঁড়িয়ে। ফিরতে পারলুম না অন্য ডেরায় নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য। বাতাসে সাঁতার কেটে চলে এলুম এদিকে।

মোতিয়ারীর মরণের মুখে জীবন হয়ে এসেছে শমরু জ্যৈষ্ঠের এক দুর্যোগভরা বিকেলে।

ঘর অবধি পৌঁছে দিতে এসেছে শমরু। সেই থেকেই রয়ে গেছে মোতিয়ারীদের ঘরে। আটকেছে মোতিয়ারী। পথে আসার সময় কথায় কথায় জানতে পেরেছে শমরু সহায়সম্বলহীন অনাথ। জানিয়েছে বাবাকে। অনুরোধ করেছে রাখতে। আদুরে মেয়ের

আরজি মেনে নিয়েছে বারা। ছেলেটা প্রাণ বাঁচিয়েছে তো তার মেয়ের। থাকলে সব কাজই করানো যাবে, আর মেয়েটার দস্যিপনার দিকে নজর রাখাও যাবে ওকে দিয়ে।

নজর রেখেছে শমরু। ঝড়বাদলে জেদী মেয়ে বেরোবেই। বেরিয়েছে। জীবন বিপন্ন করেও মোতিয়ারীকে অনুসরণ করেছে শমরু। ফিরিয়েও নিয়ে এসেছে আবার।

শমরু ফিরিয়ে আনত মোতিয়ারীকে। মোতিয়ারীও একদিন ফিরিয়ে নিয়ে এলো শমরুকে। আত্মঘাতী হতে গেছিল শমরু। আত্মঘাতী হবার কথা মোতিয়ারী নিজেই ওর মাথায় ঢুকিয়েছিল।

শমরুর অপরাধ—তাকে বিয়ে করার মত দিতে বলেছিল। আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছে মোতিয়ারীর। বলেছে, মুখ দিয়ে বেরোল কি করে একথা। বামন হয়ে চাঁদে হাত! আমায় পেতে হলে এ কাঠামো পালটাতে হবে তোকে। মরে আবার ফিরে আয়। মানুষখেকো পুকুরটায় গেলে সকলের সব দুঃখের ত্রাণ হয়। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ডুব দিলে তোরও ত্রাণ হয়ে যাবে। আমার নাম করে ডুব দিস কিন্তু।

অপরাধী-মুখ করে শমরু বলেছে, ঠিকই বলেছিস। আমার অন্যায় হয়েছে। আমি রাস্তার ছেলে।

চত্বর থেকে বেরিয়ে গেছে শমরু তাড়াতাড়ি। উর্ধশ্বাসে ছুটেছে মানুষখেকো পুকুরটার দিকে। চমক ভেঙেছে মোতিয়ারীর।

এমনভাবে রূঢ় কথা বলল কেন ওকে? একি মতিচ্ছন্ন তার। মানুষটা কুটিলকপট নয়। সাদাসাপটা। জীবন দিয়ে জীবন বাঁচাতে গেছিল ওই লোকই একদিন। সেদিন ওকে কুৎসিত দেখায়নি চোখে। আজ অত কুৎসিত মনে হল কেন? ওকে সে-ই রেখেছে এখানে। রেখেছে যখন বিয়ে করবে বলেই রেখেছে—এটা ভাবা অন্যায়? বিয়ে করার মত চাওয়াটা কি অন্যায়?

ওর সঙ্গে হেসেছে, কথা কয়েছে। দু'জনে কত ঘুরে বেড়িয়েছে

একসঙ্গে। পুরুষের মনে নারীর রূপ-লালসা বাসা বেঁধেছে। বিয়ে করতে চেয়েছে ও। অন্যায় নয় ওর কাছে। দেরী হলে মানুষটাকে পাওয়া যাবেনা আর। ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ল মোতিয়ারী।

মোতিয়ারী ফিরিয়ে এনেছে শমরুকে। বলেছে, তুই কি অবুঝ রে! আমি বললুম বলে কি তোকে মরতে হবে অমনি! তোকেই বিয়ে করবো আমি।

বিয়ের আগে ক'রাত ঘুমোয়নি মোতিয়ারী। ঘরবার করেছে কেবল। কলসী থেকে আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে মুখে কপালে ঘাড়ে চোখের পাতায় বুলিয়েছে বারবার। কি করবে? শমরুকে সান্ত্বনা দিয়ে বেশীদিন আটকানো যাবেনা। ওকে অন্য মেয়ের সঙ্গে যে বিয়ে দেওয়া যাবে, তা হবার নয়। কেউ ওকে পছন্দ করেনা। ঝুমনকে? সকলেই পাগল। ভবানী তো সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে বিয়ে করার জন্য। ঝুমনের ভাবনা নেই। ভাবনা শমরুর। শমরুর আশ্রয় একমাত্র মোতিয়ারী। মোতিয়ারীকে শমরুর আশা পূরণ করতে হবেই। নিজের সব সুখ বিসর্জন দিয়েও।....

সকলের মত উপেক্ষা ক'রে শমরুকে কাছে টেনে নিয়েছিল মোতিয়ারী। শমরুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য বিয়েও করেছিল। কিন্তু এমনই ভবিতব্য—শমরুকে বাঁচাবার জন্যই মোতিয়ারীকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

যাবার আগে ঢের যোঝাযুঝি করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে। বিধির কি অপূর্ব বিধান! যে শমরু পাহারা দিত মোতিয়ারীকে, সেই শমরুকেই দিনেরাতে সতর্ক প্রহরীর মতো পাহারা দিয়ে রেখেছিল মোতিয়ারী। চোখ মন কান—সদাসর্বদা সজাগ রাখতে হয়েছে। তিনটের একটা অসাবধানী হলে শয়তানের যাঁতাকলে পিষে মরতে হবে শমরুকে।

একদিন দু'দিন ক'রে তিরিশটা দিন গেছে। পুরো একমাস। মোতিয়ারী যম-যাতনা ভোগ করেছে একজনকে যমদূতদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য। সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেয়েছে বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে। যমদূতদের পরিচালক তারই বাবা স্বয়ং। শমরুকে গুম ক'রে ফেলার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে, অনুনয়বিনয় করেছে বাবাকে মোতিয়ারী।—আমায় ভুল বুঝেছিস তুই। শমরুকে পছন্দ করিনি আমি সত্যি, তা বলে ঘেন্না করিনি কখনো। ওকে বিয়ে ক'রে আমি মোটেই অসুখী নই। ওকে এভাবে সরালে, আমার ওপর অবিচার করবি দারুণ। ঝুমনের সঙ্গে বিয়ে দেবার বৃথা চেষ্টা তোর। ও আমার ভাই। স্বামী বলে আর কোনদিন গ্রহণ করতে পারবোনা আমি ওকে।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছে বাবা। জবাব দেয়নি। মোতিয়ারী বুঝেছে, বাবার মন টলেনি। সংকল্প থেকে নড়বেনা একচুলও। বাবার বরাবরই শমরুর ওপর বিতৃষ্ণা। মোতিয়ারী জানে। ছুতো তৈরী ক'রে অনেকবার তাড়াতে চেষ্টা করেছে। মোতিয়ারী প্রথমে বাবার গোড়ে গোড় দিয়ে, পরে মত পরিবর্তন করিয়েছে। তখনকার মতো করালেও বিতৃষ্ণার বিষাক্ত জড়তা যে ছিঁড়ে খুঁড়ে ভেতর থেকে নির্মূল করতে পারেনি—চোখ দেখে মালুম হতে অসুবিধে হয়নি তার।

তার পরমহিতকাঙ্খী যোগীনাথের আদেশ উপদেশ স্মরণ করে একাই এগিয়ে পড়েছে মোতিয়ারী। শমরুকে বাঁচাবার পথ বার করতেই হবে। বাঁচাতেই হবে—জীবনের যে কোন মূল্য দিয়েও। যোগীনাথ বলেছে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবিনা কখনো। অপরকে বাঁচাবার জন্য, নিজের জীবন বিপন্নের কথা মনে ঠাঁই দিবিনা একেবারে। সফল হবার প্রবল ইচ্ছে নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে পড়বি।

শমরুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়িয়েছে মোতিয়ারী।

ঘরে বাইরে চাষের মাঠে। শমরু কোনদিন বুঝতে পারেনি মোতিয়ারীর এ ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে বলেছে—ক্ষেতে চাষ করার সময়, মোতিয়ারী ! তুই কি মরবি শেষে ! দুপুর রোদ্দুরে মাথার চাঁদি ফাটছে। ঘরে গিয়ে আরাম নিগে যা !

শমরুর মুখে হাত চাপা দিয়ে, কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলেছে মোতিয়ারী, কি বলছিস তুই ? কেউ শুনলে আর রক্ষে নেই। ঠাট্টায় ঠাট্টায় চাষ করা দায় হবে। ওই ছাখ ! শ্যামবতী হাসছে। শ্যামবতী কি বলবে জানিস ? জানিসনা। আমি জানি। বলবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মাঠে খেটে মরে মরদ, জরু ঘরে গিয়ে কাঁথায় শুয়ে, স্বামীর ওপর দেখায় দরদ।

সারাদিন খেটে ক্লান্ত শরীরে দাওয়ায় একগাদা খড়ের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে শমরু। সন্ধ্যে থেকে রাত। রাত থেকে মাঝরাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ মেলে অবাক। গালে হাত দিয়ে শমরুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে মোতিয়ারী। বিস্ময়ঝরা গলায় বলেছে শমরু, ঘুমোসনি ! মরবি এবার।

মরার সময় এলে মরবে সবাই। আমার এখনো আসেনি।

তোর কখন আসবে জেনে বসে আছিস ?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ। মুখ ভেংচে উঠে পড়েছে শমরু।

হেসে ফেলেছে মোতিয়ারী। হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেছে।

একদিন কিন্তু ঘুমন্ত মানুষটাকে টেনে তুলতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভেতরের হাসিটা শুকিয়ে গিয়ে সারা শরীরের রক্তকণা হিম হিম হয়ে এসেছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে শমরু। নাক ডাকার আওয়াজটা বড্ড বেশী জোর শোনাচ্ছে গহিন রাতে। চাপা পড়ে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। সেটা চৈত্রের অষ্টমীতিথি। আকাশে আধখানা চাঁদ। মরা আলো হলেও, তিনদিক থেকে যে তিনজন বর্শা

তীরধনুক টাঙি হাতে নিয়ে শমরুর দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের চিনতে অসুবিধে হয়নি মোতিয়ারীর। তারা—বাবা ঝুমন আর তুলারাম—শ্যামবতী সইয়ের স্বামী। ওরাও মোতিয়ারীকে দেখেছে। এক মুহূর্ত দেরী না করে যে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সে সেদিক ফিরে দৌড়ল। এসব জানেনি শমরু। মোতিয়ারী জানায়নি। তারপর থেকেই ওকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। অষ্টপ্রহর। চোখের আড়াল করতে চায়না একদণ্ড। আড়াল করতে বারণও করে গেছে শ্যামবতী গোপনে। তার স্বামী ঝুমন আর মোতিয়ারীর বাবা—তিনজনে মিলে মোতিয়ারীর সুখের পথের কাঁটাটা উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেনা। যে কোন উপায়ে হোক শমরুকে শেষ করবেই ওরা। আঙিনার বাইরে বেড়ার ধারে বটের ছায়ায় বসে বসে শলাপরামর্শ চলে। খাবার দেবার ছল করে ওদের অসতর্ক মুহূর্তে গিয়ে পড়ে প্রায়ই শুনে ফেলে শ্যামবতী। মোতিয়ারীকে না পাওয়ার আগুন জ্বলছে ঝুমনের বুকে-মাথায়। নেভেনি। শমরু বেঁচে থাকতে নিভবেনা ও। বন্ধুর আগুনের ছোঁয়া লাগছে নাকি তুলারামের বুকে-মাথায়। তুলারাম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে মোতিয়ারীর ওপরেই বেশী। মোতিয়ারীটাই তো সব কষ্টের মূল। দয়া নেই মায়া নেই প্রেম নেই। আস্ত একটা ডাইনী। বন্ধুকে খেলিয়ে খেলিয়ে লাথি মেরে দূর করে দিয়ে মজা লুটছে শমরুকে নিয়ে। বন্ধুটাকে পাগল করে ছেড়েছে। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে ওর রক্ত শুষে নিচ্ছে। শেষ না করে ছাড়বেনা বুঝি। মোতিয়ারীই যে বন্ধুর সাক্ষাৎ মৃত্যু—একথা শতসহস্রবার কানে ঢোকালেও ঢুকছেনা। সীতারাম নাম জপের মতো মোতিয়ারীর নাম জপ চলছে মনে-মুখে—জেগে-ঘুমিয়ে।

সব কাজের মধ্যেও মোতিয়ারী ভেবেছে, নিজেকে কি করে সবার চোখের আড়াল করে রাখা যায়। রাখলে, হয়তো ধীরে ধীরে ভুলবে ঝুমন। তুলারামের মাথা ঠাণ্ডা হবে। মেয়েকে না পেলে আর কাকে

নিজের ভুল ধারণার বশে মিথ্যে সুখী করবার চেষ্টা করবে বাবা? মিছিমিছি একটা নিরীহ লোককে খুন করে ফেলার ষড়যন্ত্র থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। শমরু প্রাণে বাঁচবে।

শমরুকে বাঁচানোর পথ খুঁজেছে মোতিয়ারী অন্তরে অন্তরে। কানের কাছে কে যেন অভয়বাণী শুনিয়েছে—পাবে। অপেক্ষা কর। সচেতন হয়ে উঠে নিজে নিজেই হেসেছে। একথা তো যোগীনাথের। যোগীনাথ বলেছে তাকে। একবার নয়, বহুবার। যখুনি নিজেকে অসহায় ভেবে বসেছে মোতিয়ারী, তখুনি ছুটে গেছে অশথতলায়। যোগীনাথই ভরসা দিয়েছে। আশ্বস্ত করেছে।

মনভরা শান্তি নিয়ে ফিরেছে মোতিয়ারী ডেরায়।

মাসখানেক পর পথের নিশানা পেয়েছে মোতিয়ারী নিজেকে সরানোর, শমরুকে বাঁচানোর।

সেটা রামনবমীর দিন।

ভরতপুরে রামচন্দ্রের জন্ম-উৎসব পালন করছে রামভক্তরা—যে যার ঘরে। মোতিয়ারী শমরুকে নিয়ে যোগীনাথের দর্শনে গেছে। শুভদিনে আশীর্বাদ পাবে। অশথতলায় বসে বসে বিস্মিত চোখে দেখেছে আর উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে মোতিয়ারী। অদূরে ফাঁকা মাঠটায় দু'কোণে দুটো লম্বা শক্ত শালখুঁটি পোঁতা। পূবদিকের খুঁটির মাথা পর্যন্ত একটা মজবুত মোটা পাটের দড়ি টেনে বাঁধা। পূবদিকের খুঁটির গায়ে মই লাগানো। মই বেয়ে ঘাগরা-কাঁচুলি পরা মেয়েটা তাড়াতাড়ি উঠল কেমন চোখের পলকে। খুঁটির মাথায় দাঁড়িয়ে। চারদিকে চোখ ঘুরছে। লোক জমায়েত কত— আঁচ কবতে চেষ্টা করছে। ফিক করে হাসল নিচের জোয়ানটার দিকে চেয়ে। বোঝা গেল ভিড় দেখে খুশী যুবতী। দড়ির খেলায় যে কসরৎ দেখাতে হবে ওকে—তার ইনাম উঠে আসবে অনায়াসে।

মোট কথা, দু'পয়সা কামানো যাবে খেলা দেখিয়ে। ওর চোখের নাচুনি সেই ইঙ্গিতই করল যেন।

হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান মরদের ঠোঁটে হাসি, চোখে হাসি। নিচের দিকে পাজামার ধুলো ঝেড়ে নিল চটপট করে। বুক চিতিয়ে মির্জাইয়ের ফিঁতে বাঁধা ফাঁসের ওপর হাত বুললো। এবার বুকে ঝোলানো ঢোলকের দড়িটার ওপর। ঢোলকে চাঁটি পড়ছে দুপাশে, দু'হাতের।

খুঁটি থেকে ডান পা শূন্যে তুলে, নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েই দড়ির ওপর পা ফেলে ফেলে চলতে শুরু করে দিয়েছে তরুণী। ডান হাত কানে আর বাঁ হাত কোমরে। গলা ছেড়ে গাইছে, আসমান মে আয়ো খুশিয়াঁ বাহার/আয়ো সেঁইয়া, সখিয়া হামার। আকাশে ভাসে আনন্দ-জোয়ার/বঁধু আয়, আয় ছুটে সই আমার।

মাঠসুদ্ধ লোককে দড়ির ওপর থেকেই-ডাকছে মেয়েটা হাত নেড়ে নেড়ে। সকলের মুখে মুখে খুশির আমেজ। মোতিয়ারীর মনে হচ্ছে, ও ডাকছে আর কাউকে নয়। তাকেই বুঝি।

খেলার শেষে, গেছে মোতিয়ারী ওদের তাঁবুতে। মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সমস্ত শরীর নাচিয়ে ঠমকে ঠমকে কাছে এসে হাজির। হাত ধরে মিষ্টি করে বলেছে, বোন তোর ভাল লেগেছে বুঝি খুব? শিখবি? ক'দিন তো এখানে আছি। আসতে পারিস তো রোজ একবার করে।

অশান্ত মনে শান্তিবারি ঢাললো যেন এ মেয়ে। এ মেয়ে মোতিয়ারীর সবার চেয়ে আপন। একান্ত আপনজন। তাই মনে হল। মোতিয়ারীর মাথার মধ্যে একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল, 'ক'দিন তো এখানে আছি'। থাকবেনা বেশীদিন। এদের সঙ্গে ভাব করে পালানোর সুবিধে হবে। শমরুকে বাঁচাবার জন্য পালাতে চেয়েছে। পথ পেয়েছে। সকর্ণে শুনেছে বিধি তার মনের কথা।

মৃদু হেসে মাথা নেড়েছে মোতিয়ারী। আসবে। রোজ একবার করে আসবে। যে কদিন থাকবে ওরা।

মেয়েটা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে খানিক। তারপর বলেছে, আয় আলাপ করিয়ে দিই আমার মরদের সঙ্গে। ও আর আমিই তো দলের সব—হর্তা-কর্তা-বিধাতা। এখানে এসে আমায় না পেলে, ওকে ডাকলেই আমার কাছে পৌঁছে দেবে। ওর নাম তুফান। আমার নাম জুলমা। নাম দুটো মনে রাখিস।

মাদুরের তাঁবুর ভেতর হাত-পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে তুফান। মুখে জলন্ত বিড়ি বাঁহাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা। ঘণ্টা খানেক ধরে নাচ গান আর ঢোলক বাজানোর ক্লান্তি দূর করছে হয়তো অলস মুহূর্তে। দেখে, নিজেকে বিব্রত বোধ করেছে মোতিয়ারী।

জুলমা তুফানের গায়ে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে হো-হো করে হেসে উঠেছে, কোন নাগরীর কথা ভাবছিস এতো? আমাকে কি পছন্দ হচ্ছে না আর তোর? যে জানানাকে শত লোক চায়—তোর তরে বাউরী সে, তবু তোর মনঃপূত নয়, বুক ফাটা হায় হায় হায়!

সচেতন হয়ে তুফান উঠে বসেছে। বিড়িটা দাঁতে চেপে, লাল শালুর সরু ফালিটা বাবরী চুলে কপালের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে নিয়েছে। আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে মোতিয়ারীকে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে।

আ-মর মিনসে! লজ্জা দেখে আর বাঁচিনা। ঝাঁঝিয়ে উঠেছে তুফানী। মুখ তোল, কথা বল। আমার বোন রে, নতুন বোন।

প্রথম দিনের মৌনলাজুক মানুষটা দিনের পর দিন মুখর হয়ে উঠেছে, দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে মোতিয়ারীকে দড়ির খেলা শেখানোর সময়। দড়ির ওপর ঠিকমতো পা রাখতে না পেরে পড়ে গেছে মোতিয়ারী। মাটিতে পড়েনি।

এমন সতর্ক দৃষ্টি, এমন পাহারা—মাটিতে পড়তে দেয়নি। লাফিয়ে উঠে, দু'হাতে লুফে নিয়েছে তুফান মোতিয়ারীকে। ভয়ে মোতিয়ারীর বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। তুফানকে জড়িয়ে ধরেছে দু'চোখ বুজে।

মোতিয়ারী এইভাবে দড়ির খেলা শিখেছে। দড়ির ওপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যায় খুঁটির এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত অনায়াসে। জুলমা বলে, তুই আমাকেও ছাড়িয়ে যাবি। দেশী-পরদেশী লোকের কাছ থেকে ঢের—ঢের বেশী বাহবা কুড়োবি।

দেশ ছেড়ে ঘর সংসার ছেড়ে অজানা দেশে পাড়ি দেবার জন্য মোতিয়ারীর ভেতরে যে প্রস্তুতি চলছিল, ঘুণাক্ষরে টের পায়নি বাইরের জনপ্রাণীও। এমন কি শমরুও। শমরুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে প্রতিদিন। কোথাও একলা রেখে আসেনি। শমরু কিছু না জানলেও, মোতিয়ারী জানে, ওর পেছনে নরখাদকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফাঁক পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি চেপে ধরবে। ওর রক্ত আকণ্ঠ পান করে তাদের পৈশাচিক পরিতৃপ্তি মেটাবে। শমরুকে সামনে বসিয়ে রেখে খেলা শেখে মোতিয়ারী। শমরু হাসে আর বলে, দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছিস যেন তুই। এসব খেলা শিখে হবেটা কি শুনি তোর? করবি তো চাষবাস—

তুই থাম দিকিনি মুখপোড়া!

মুখ ঝামটা দিয়ে বলে মোতিয়ারী, মানুষের কত রকমেরই তো খেয়াল আছে—এই ধরনা—তোর যেমন মহুয়ার রসে ডুবে থাকার খেয়াল। মনে করনা—আমারও এটা একটা খেয়াল····দড়ির খেলায় ডুবে থাকার খেয়াল····অন্তত অষ্টপ্রহরের কিছু সময়টাও।

একথা শোনার পর বড় একটা হাসিমস্করা করত না শমরু এ ব্যাপার নিয়ে। তবে মাঝে মাঝে অন্তরের আকুল-আকুতি জানাতে ছাড়েনি।—পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙলে, কি হবে বল দিকিনি? মারাও তো পড়তে পারিস!

মারাও তো পড়তে পারিস! মুখ ভেংচে শমরুর কথারই প্রতিধ্বনি করেছে মোতিয়ারী। বলেছে, মোতিয়ারীর পরমায়ু যখন ফুরবে, তখন তুই তাকে রুখতে পারবি? পারবি না। ঈশ্বরের

কলমের ওপর কলম চালানো দুঃসাধ্য! যোগীনাথ বলে, বসে বসেও তো মরে মানুষ, আবার বাঘ-সাপের মুখ থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরেও আসে কেউ কেউ।

সজল হয়ে উঠেছে শমরুর দুচোখ। মোতিয়ারী মোলায়েম গলায় বলেছে, তোর মোতিয়ারী যমরাজের দু'চক্ষের বিষ। এত শীগগির মরবেনা, মরবেনা।

মোতিয়ারী মরলনা। কিন্তু শমরুর কাছে মরার বাড়া হয়ে উঠল। মোতিয়ারী পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। নিথর রাতের কোন প্রহরে কে জানে—সমস্ত শিওনীটা যখন ঘুমে অচেতন—হয়তো বা সেই সময়ে। ঘুম ভেঙে চমকে উঠেছে শমরু। পাশে নেই মোতিয়ারী। এরকম হয়না। মোতিয়ারীই শমরুকে ডেকে ঘুম ভাঙায় রোজ। খুঁজেছে চতুর্দিকে। পায়নি। পুকুরে জাল ফেলেছে, পায়নি। তুফানের তাঁবুতে এসেছে খুঁজতে। কোথায় তাঁবু পাবে যে, খুঁজবে। তাঁবু অদৃশ্য। জায়গাটায়ই এসেছে শুধু। ছোটবড়—সকলেই একবাক্যে বলেছে, মোতিয়ারীকে ওরাই নিয়ে গেছে নিশ্চয়। যোগীনাথকে জিজ্ঞেস করলে, উত্তর পায়নি কেউ। নিরুত্তর থেকেছে যোগীনাথ।

আবার যত রোষ-আক্রোশ যোগীনাথের ওপরই গিয়ে পড়েছে। শমরুর, বাবার, ঝুমনের। ঝুমনের অন্তরঙ্গ বন্ধু তুলারামেরও। যোগীনাথের কাছে যত আলাপ-আলোচনা হত মোতিয়ারীর। এই বুড়ো তুফান-জুলমার সঙ্গে ষড় ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। বুড়ো ভালোমানুষ সেজে মৌনী হয়েছে এখন। কিছু জানেননা যেন। হাড়বজ্জাত, মিটমিটে ডান!

যাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদের শক্ত পাঁচিল গড়ে উঠেছিল, সেই চলে যাওয়ামাত্র সে পাঁচিল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শত্রু মিত্র হয়ে গেল। নেপথ্য-পুরুষের কি

অদ্ভুত লীলা। মোতিয়ারীর পূর্ব প্রণয়ী ঝুমন আর স্বামী শমরুতে গলায় গলায় হয়ে উঠল। তাতে এসে যোগ দিল তুলারাম। আর মোতিয়ারীর বাবা? বাবা তো এদের তিনজনের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে বসে যুক্তি আঁটছে কেবল। কিভাবে কোথায়—কোন দেশে গেলে, তার প্রাণের পুতুলীকে খুঁজে বার করে আনা যায়।

খুঁজে বার করা গেল মোতিয়ারীকে। নাগপুরে দড়ির ওপর দিয়ে চলছিল তখন। দড়ি থেকে নামার পর বাবা এসে জড়িয়ে ধরেছে। ফিরে যেতে বলেছে। এ মরণ-খেলা সাজেনা তার। কি দুঃখে দেশত্যাগী হল সে? জানলে, দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করবে বাবা প্রাণ দিয়েও।

বাবার বুক থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সরে গেছে মোতিয়ারী নির্বাক মুখে। এগিয়ে এসেছে ঝুমন।—ফিরে চল, তোকে আমি ঘরে তুলে নেব। আবেগ জড়ান কথায় ঝুমন অনেক অনুনয়-বিনয় করেছে। ফল হয়নি। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে বলে উঠেছে মোতিয়ারী।—একি কথা! ভাই না? দু'কানে আঙুল দিয়ে মোতিয়ারী সরে গেছে আরো অনেক তফাতে। এসেছে শমরু। কথা কয়নি। দু'চোখ ভরে দেখেছে শুধু। বুকের ব্যথা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নজর এড়ায়নি মোতিয়ারীর। ওরও দু'চোখের কোণ জ্বালা-জ্বালা করে উঠেছে। বেসামাল হয়ে পড়ার ভয়ে তাঁবুর দিকে ছুটে গেছে। যেতে যেতে সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলে গেছে, আমি ফিরবো না। উত্যক্ত করতে কেউ আসবে না কোনদিন কোন জায়গায়। তোদের কারো মুখ দেখতে চাইনা আমি। চাইনা, চাইনা।

লোকে লোকে ছয়লাপ।

দড়ির ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ওমাথা থেকে এমাথায় আসছে মোতিয়ারী। দর্শকদের চোখে বিস্ময়, মনে ভয়। ছেলেবুড়ো নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছে। আগের আনাড়ী মেয়ে নেই আর। দড়ির খেলা দেখানোয় নিপুণ এখন। মোতিয়ারীর কাছে হার মেনে যায় জুলমাও। জুলমা দর্শকদের মতোই দেখছে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। খুব কাছ থেকে। তুফান আর সতর্ক দৃষ্টি রাখেনা তেমন। রাখার প্রয়োজন নেই। তবু অভ্যস্ত পা চলে ঠিক মাটির বুক মাড়িয়ে মাড়িয়ে,— দড়ির ওপর মোতিয়ারীর প্রতি পদক্ষেপের ঠিক নিচে নিচে।

তুফান ঢোলক বাজিয়ে বাজিয়ে চলছে আর তাকাচ্ছে থেকে থেকে ওপর দিকে। হ্যাজাকের আলোয় গোটা মাঠটায় আকাশের জ্যোৎস্না। মোতিয়ারী গান গাইতে গাইতে এগোচ্ছে। প্রথম কলির প্রথম শব্দটা 'আসমান মে' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওকে মনে হচ্ছিল, ও এ দুনিয়ার মেয়ে নয়। আসমানেরই মেয়ে বুঝি।

মোতিয়ারী তখন দড়িটার মাঝ বরাবর এসে গেছে। 'আসমান মে' কথাটা মুখ দিয়ে বেরোতেই মুখখানা কে যেন চেপে ধরল। কে যেন গলাটা টিপে ধরল সজোরে। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে মোতিয়ারীর। পা টলছে।

জমাট ভিড়ের বুক কেঁপে উঠছে নির্ঘাৎ বিপদের আশংকায়। তুফান চিৎকার করছে, জুলমা চিৎকার করছে, মোতিয়ারী হুঁশিয়ার! মোতিয়ারী হুঁশিয়ার!

কে হুঁশিয়ার হবে? মোতিয়ারী? মোতিয়ারীর কানের দরজা বন্ধ। শুনতে পাচ্ছেনা। ভয়েত্রাসে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি যেন দেখল। দু'হাত বাড়িয়ে কাকে বাঁচানোর জন্য ধরতে গেল, আর সেই সঙ্গে কেঁদে উঠল মর্মান্তিক কান্না।—যোগীনাথকো বাঁচাও। স্থানকালপাত্র ভুলে, শূন্যেই পা ফেলল দড়ি ছেড়ে মোতিয়ারী। সমস্ত মাঠটা জুড়ে 'গেল গেল' রব উঠল।

পড়ে গেল মোতিয়ারী।

মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে হলনা তাকে তুফানের তৎপরতায়। তুফান ধরে ফেলেছে। তবে ডান পাটা বেশ জখম হয়েছে মোতিয়ারীর। উঠতে পারছেনা, দাঁড়াতে পারছেনা। পাঁজাকোলা করে তাঁবুর ভেতর নিয়ে গেল তুফান।

মোতিয়ারীর কথা মতো শিগুনীতে যোগীনাথের খবর আনতে গেছে তুফানের লোক। নির্মম দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে। ঠিক ওই সময়টায় কে বা কারা নাকি খুন করেছে যোগীনাথকে। সামনে দড়ির ওপর থেকে নিচে পড়ে যেতে দেখেছিল যোগীনাথকে মোতিয়ারী। মোতিয়ারী শুনল টাঙির ঘায়ে ঘায়ে নিরীহ যোগীনাথকে শেষ করেছে কারা। কারা? মোতিয়ারীর চোখের সুমুখে ভেসে উঠেছে এক একখানা মুখ। বাবা, ঝুমন, শমরু, তুলারাম!

মোতিয়ারী ভেঙে পড়েছে। যার ভরসায় এতদিন বুক বেঁধেছিল, তার ভস্মস্তূপের কথা ভেবে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে পৃথিবী কি নির্দয়!

তখনকার মতন পৃথিবীর দোষ দিলেও পরে বুঝেছিল মোতিয়ারী, তাব নিজের অদৃষ্টই তার সঙ্গে প্রত্যেক বারেই শক্রুতা ক'রে চলেছে। মারাত্মক শক্রুতা। প্রমাণ পেয়েছে এরপরও দু'বার!

পায়ের জন্য উত্থানশক্তি রহিত দিনসাতেক ধরে। এর মধ্যে যখুনি সুযোগ সুবিধে পাচ্ছে, জুলমা, কাছে এসে বসছে আর মোতিয়ারীকে একেবারে নিজের করে নেবার জন্য নিজের আত্ম-কাহিনী শোনাচ্ছে। নিজের বংশের ধারা বর্ণনা করছে মোতিয়ারীকে।

শুনবোনা শুনবোনা করেও, বিরক্ত হয়েও শুনতে হচ্ছে। নিরুপায়। না শুনলে রেহাই নেই। জুলমা স্ত্রী হয়ে স্বামীর জন্য এসব কি বলছে

—শুনে তাজ্জব বনে গেছে মোতিয়ারী। জুলমার বক্তব্য খুব সোজা। পাঁচ বছরের শিশুও বুঝতে পারে। অতএব তার বোঝার ভুলচুক নেই কোন।

জুলমা জানিয়েছে, তাদের কোলাতি জাতের ভেতর এসব দোষ বলে গণ্যই করা হয়না। রূপযৌবন তো সেই সেই লোকের জন্য, যারা মুগ্ধ হয়, ভোগের বস্তু হিসেবে দেখে। খেলা দেখে পাগল হয়ে, কত রোহিসই তো লালসা মাখানো চোখে চেয়েছে তাকে। ওদের বিফল না করার জন্য জুলমারও কম লাভ হয়নি, প্রচুর টাকা কামিয়েছে। তবে তুফানের নজরে পড়ে যাওয়াটাই সবের মূলে। তুফানই তার চাহিদাটা বাড়িয়ে তুলেছে দর্শকের চোখে, বাড়িয়ে তুলেছে কামনাপাগল লোকের চোখে। তুফান যে-ভাবে দেখেছিল জুলমাকে, সেই ভাবেই দেখে মোতিয়ারীকে। ওর ব্যাপারে মোতিয়ারী সদয় হ'লে, মোতিয়ারীর নিজেরই মঙ্গল। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তুফানের দৃষ্টি পড়ার জন্য অনেক মেয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুর্ভাগ্যের জন্য দৃষ্টি পড়েনা তাদের ওপর। মোতিয়ারী ভাগ্যবতী; তা নাহলে অল্পদিনে তুফানের অন্তর জয় করে ফেলেছে!

মোতিয়ারী নিস্পন্দ। বিস্ফারিত দু'চোখের তারা দুটো পাথুরে হয়ে গেছে। দেখেছে জুলমাকে। বিচিত্র সমাজের বিচিত্র নারী। জুলমা যা করেছে, জুলমার সমাজেই চলে। মোতিয়ারীর সমাজে নয়। পা তুলতে পারেনা মোতিয়ারী। উঠে বসতেও না। সুস্থ হলে পালাবে। কিন্তু কোথায় কার কাছে? অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চতুর্দিকে। দু'চোখ বুজে মরার মতো পড়ে থেকেছে। মনে মনে বলেছে, এ তোর কেমনতর কাণ্ড ভগবান? এ তোর কেমনতর বিচার?

মৌন সম্মতির লক্ষণ—মোতিয়ারীর মুখ থেকে কোন জবাব না পেয়ে, এটাই ধরে নিয়েছে জুলমা। এই ধরে নেওয়ার যা ফল, তাই ফলল দিন আষ্টেকের মধ্যে। দেওয়ালির রাত। বাজি পোড়ানো

নিয়ে মশগুল সবাই। তাঁবুতে নেই কেউ। একলা শুয়ে আছে মোতিয়ারী। ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করল। উঠতে পারল। পায়ের ব্যাথাটা কমেছে অনেক। বসে আছে। তাঁবুর পরদাটা আধখোলা। বাইরের আলো ঢুকছে ভেতরে। পরদা তুলে ওঠার সঙ্গে আলোটা কেঁপে উঠল থরথর করে। একখানা হাসিমাখা মুখ উঁকি মেরেই অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। জুলমা। মোতিয়ারীর বুক কেঁপে উঠল। জুলমার হাসিটা যেন কেমন কেমন। ভয়ংকর বিপদের সংকেত যেন। সংকেতই বটে। ভেতরে ঢুকল তুফান। মানুষটার মূর্তি আলাদা, চাউনি আলাদা। খেলা দেখানো খেলা শেখানোর সময়ের সে মানুষ নয়। মদে চুর। পা টলছে। দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে মোতিয়ারী, পারছেনা। পায়ে টান ধরছে। যন্ত্রণায় মাথা অবধি টনটন করে উঠছে। মাটিতে পাতা মাদুরটা যেন মাটির সঙ্গে যোগসাজস করে মোতিয়ারীর ডানপাটা টেনে রেখেছে। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য দু'হাতের উপর চাপ দিয়েছে সবে, নির্লজ্জ মানুষটা এক মূহূর্ত দেরী না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে জুলমার হাসির আওয়াজ শুনেছে মোতিয়ারী। আর তখুনই আবার হাসি থেমে যেতে শুনেছে! আর আশ্চর্য হয়ে শুনেছে জুলমার করুণ কণ্ঠস্বর।—আগুন, আগুন।

উঠে পড়েছে তুফান। ছুটে বেরিয়ে গেছে তাঁবু থেকে। সামনের তাঁবুটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। দেখতে পাচ্ছে মোতিয়ারী। হাওয়ার গতি এদিকে। আগুনটা লাফিয়ে আসছে। ওর সর্বগ্রাসী ক্ষিদে নিয়ে ঘিরে ধরবে এ তাঁবুটাকেও সমস্ত শক্তি দিয়ে। পরিষ্কার সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তার ভেতরের অসহ্য জ্বালা আগুনে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তাঁবুর পরদাটা জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠছে সব। যেদিকে তাকাচ্ছে মোতিয়ারী—সেদিক। তাপ আর তাপ। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে শুয়ে

আছে মোতিয়ারী। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কেন জানেনা একটু আগের মরার ইচ্ছেটা উবে গেছে কোথায়। বাঁচার জন্য ভেতরটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে দারুণ। উঠে পালাবার কি দারুণ উত্তেজনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পায়ে আঘাত লাগার কথা, ব্যথার কথা ভুলেছে মোতিয়ারী।

সর্বশরীরের জোর পায়ে এসেই বসেছিল বোধহয়। ডান পায়ে মনে হল, কে যেন ধরে আছে পেছন দিকটায়—আগুনের দাপট যেখানে কম—ছুঁড়ে ফেলে দিল। ছিটকে এসে ধাক্কা খেল যেটায়—সেটা মাটি নয়, গাছপাথর নয়। জলজ্যান্ত একটা মানুষের বুক। ওই বুকের জন্যই মোতিয়ারী বেঁচে গেল পুড়ে মরার হাত থেকে।

মোতিয়ারীকে উদ্ধার করতে আসেনি কেউ, কিন্তু এসেছিল একজন। রাজারাও। মারাঠী যুবক রাজারাও বাসনের ব্যবসায়ী। ঘরের জানালা দিয়েই তাঁবু জ্বলতে দেখতে পেয়ে, ছুটে এসেছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে পেছন দিকে আগুন ডিঙিয়ে ঢুকেছে তাঁবুতে। মোতিয়ারী বুকে এসে আছড়ে পড়তে, কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়েছে।....বাড়িতে এনে, মোতিয়ারীর ঝলসানো দেহের চিকিৎসা করিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে।

সুস্থ হয়ে উঠে মোতিয়ারী চলে যেতে চেয়েছিল, আটকেছে রাজারাও। এই মারাত্মক দড়ির খেলা দেখাতে দেবে না সে আর। খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে রোজই যেত সে। পড়ে যাওয়ার দিন স্বচক্ষে দেখেছে। মনে পড়লে, এখনো শিউরে ওঠে সারা দেহ। তারপর থেকে তাঁবুতে গিয়ে, মোতিয়ারীকে রোজ একবার করে না দেখলে, মনের অস্থিরতা কমতনা। মোতিয়ারীকে প্রথম দিন দড়ির ওপর দেখেই মনে হয়েছে, এমেয়ে অনেক পরিচিত—কত যুগ যুগ ধরে পরিচয় বুঝি এর সঙ্গে।

শুনে, নিজের পুরো ইতিহাস শুনিয়েছে রাজারাওকে মোতিয়ারী। একটা কথা একটা দিক রেখে-ঢেকে বলেনি।

স্নেহ-সহানুভূতি আন্তরিকতার টুকরো রাজারাওয়ের প্রত্যেক কথায় ঝরেছে। রাজারাও বলেছে, তোমায় নিজের ঘরণী ক'রে মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে চাই আমি।

মোতিয়ারী হাসছিল এতক্ষণ। গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কি যেন কি ভাবল, কি যেন কি শুনল উৎকর্ণ হয়ে। শোনা-ভাবার শেষ হল বুঝি কয়েক পল পর। বলল, আমায় নিয়ে তুই সুখী হতে পারবিনি কোনদিন।

সুখী হওয়া না হওয়া সেটা আমি বুঝবো। তুমি চিন্তা করোনা।

আমার সুখটা চাস্ তো তুই ?

নিশ্চয়।

আমি সুখী হব না তোর কাছে। আমার মন বলছে, যেমন বাঁচিয়েছিস, তেমনি মরণের মুখে তুই-ই ঠেলে দিবি একদিন।

এটা পাগলের কথা। তোমার মনের ভয় স্রেফ। জীবন থাকতে মরতে দেবনা তোমায় কক্ষনো।

একটা বিষণ্নমধুর চাপা হাসি মোতিয়ারীর ঠোঁটের কোণে উঁকি মেরেই মিলিয়ে গেল।

বিয়ে হয়ে গেল মোতিয়ারীর রাজারাওয়ের সঙ্গে।

মোতিয়ারীর কোন যুক্তি ওজর আপত্তি মানেনি রাজারাও। বিয়ে ক'রে খুব খুশী। মোতিয়ারী খুশী হতে চেষ্টা করেও, হতে পারেনি। কেবলি ভয় ভয়। সুখের সংসারে ফাটল ধরতে দেখে ঘুমিয়ে-জেগে। স্বপন দেখে, সব ছেড়ে এক নির্জন জায়গায় একা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। জেগে স্বামীর কপালের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে। দু' টুকরো রেখাটার মধ্যিখানে শিবের ত্রিনয়নের মতো একটা জ্বলন্ত চোখ। পারে তো মোতিয়ারীকে গিলে খায় ওই চোখটা।

কি এত ভাবছো কপালের দিকে চেয়ে চেয়ে? মুখখানা অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কেন? ঘুম ভাঙার পর চোখে চোখ পড়তে প্রশ্ন করেছে একদিন রাজারাও।

কি দেখে, মোতিয়ারী বলেছে। হেসে চিবুক ধরে নেড়ে দিয়েছে রাজারাও। —আচ্ছা সব উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা আসে তোমার মাথায়! মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দাও ওসব!

ঝেড়েমুছে ফেলে দিতে গিয়ে আরো যেন সযত্নে তুলে রেখেছে মোতিয়ারী মনের ভাঁড়ারে। যেটা রাজারাওয়ের কাছে উদ্ভট কল্পনা, সেটা মোতিয়ারীর চিন্তাভাবনায় যথার্থ সত্যি। মোতিয়ারীর কেবলি মনে হয়, কে ডাকছে তাকে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে কে বলছে তাকে! এ ডাকের এমনিই আবেগ—বুকের তলায় আলোড়ন তোলে। ঘরে তিষ্ঠতে দেয়না।

নিশুতি রাতে নেয়ারের চারপাই ছেড়ে উঠে পড়ে। ঘরের দরজা খোলে, সিঁড়ি বেয়ে নামে, সদরের ছিটকিনি টেনে নামিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোয়। হনহনিয়ে চলতে চলতে ফাঁকা মাঠে এসে পা দু'টো আপনা হতেই থেমে যায়। বসে পড়ে মোতিয়ারী। মনটা হালকা হয়ে ওঠে। মনটা খুশী হয়ে ওঠে। আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

এরকম অবস্থায় অনেকবার ঘরে নিয়ে গেছে রাজারাও! ঘুম ভেঙ্গে স্ত্রীকে না দেখে মাথায় বাজ পড়েছে। বাড়িতে খুঁজে পায়নি! পথে বেরিয়েছে। সামনের মাঠটায় কে যেন বসে আছে। দৌড়ে গেছে। যা ভেবেছে, তাই। মোতিয়ারী। পিঠ ছুঁতেই চমকে উঠেছে। কোন রাজ্য থেকে কোন রাজ্যে আছাড় খেয়ে পড়ল বুঝি।

ঘরে এনে, পাখি পড়ানোর মতো ক'রে রাজারাও বুঝিয়েছে, এটা ঠিক নয়। বাইরে এলেই যদি ভালো থাকো, আমায় সঙ্গে নিয়ে এসো। একলা এসোনা।

শোনেনি মোতিয়ারী। একলাই এসেছে। পরের বার তার-পরের বার—অনেক বার।— কেন কথা শোন না? জিজ্ঞেস করলে নির্বিকার মুখে জবাব দিয়েছে, কিছুই মনে থাকে না, কারো কথা মনে পড়ে না ওসময়।

এ কেমন কথা। মনোব্যাধি নাকি? দিনেরাতে ভেবেছে রাজারাও। ভেবেছে শুধু নয়, ডাক্তার-বৈদ্য দেখিয়েছে। ব্যাধি সারানোর কোন ত্রুটি করেনি।

মোতিয়ারী আগে যা ছিল, পরেও তাই রইল।

রাজারাওয়ের সেবাযত্নের তুলনা হয় না। এ ঋণ শোধ করা যাবে না জন্মজন্মান্তরেও। তবুও এমন লোককে ভয় কেন? এমন লোকের কাছে ভালো লাগেনা কেন? কেন, কেন?

বিয়ের পর মাস দু'য়েক ধরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলেছে রাজারাওকে নিয়ে। অবসান হয়েছে তৃতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তায়। ভয়ের ছায়া তার পেছনে পেছনে কেন ঘোরে—সূত্র খুঁজে পেয়েছে। হাতেনাতে প্রমাণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে রহস্যের যবনিকা। দেখেছে গোপন দৃশ্য, শুনেছে গোপন সংলাপ।

পা দু'টো আপিস ঘরের বাইরে—চৌকাঠের এপারে আটকে পড়েছে।

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মতন ঘরের বাইরে কাদের ডাকে ঘুম ভেঙেছে মোতিয়ারীর। দু'হাতে চোখ রগড়ে তাকিয়েছে। পাশের চারপাইয়ে রাজারাও নেই। সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসতেই বুকের মাঝ-খানটায় কাঁপুনি ধরেছে। আপিসঘরে চাপা গলায় কথাবার্তা চলছে! গলার স্বর চেনা। তুফানের।

সিংজী, তুমি দেখছো তো—মোতিয়ারী খাসা মেয়ে। মাঠের ওদিকের ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকো গে! ভালো ক'রে দেখতে পাবে। এ সময় ও যায় ওখানে। হয়তো ওর আগের মানুষের জন্য মনটন খারাপ হয়। ওখানে একলা বসে থাকতে ভালো

লাগে। রাজারাওজী আপত্তি করে না। বেশী কড়াকড়ি করলে, চিড়িয়া উড়ে যেতে কতক্ষণ।

এবারে রাজারাওয়ের কণ্ঠ।—বুদ্ধির তারিফ করতে হয় তুফানের। তুফানই তো আমাকে দিয়ে অব্যর্থ টোপ গেলাল ওকে। উদ্ধার করার মতলব বাতলে দিল ছুটে এসে। তাঁবুতে আগুন ধরানোর ব্যাপারটা তো ওরই মাথা। আমি হাতেকলমে করেছি স্রেফ। তোমার জন্য কত কাণ্ডই না করলুম। ওকে বিয়ে করে আটকালুম। আমাদের দিকটা একবারও তাকাচ্ছো না ভাই। খাণ্ডেনঅলা ওর দর দিয়েছে তোমার দ্বিগুণ। তবে তোমাকেই প্রথম থেকে কথা দেওয়া ছিল—তাই বলা! জীবন যাক, জবান থাক। বিবেচনা করে নিশ্চয় বাড়াবে আরো।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। —অচেনা মানুষের অচেনা গলা।

লাল বনাতের পরদাটা হাওয়ায় উড়ছে। পরদার রিংগুলো টুং-টুং করে বাজছে পেতলের রডের ওপর। সরছে এক এক করে একটু একটু। একটা চোখ যাবার মতো বাঁ-পাশটা ফাঁক হয়েছে। মোতিয়ারীর দৃষ্টি যাচ্ছে ভেতর অবধি। টেবিল ঘিরে তিন দিকের চেয়ারে বসে আছে ওরা তিনজনে। নতুন মুখ মিটিমিটি হাসছে। দু'পাশে দু'জনে ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলল।

নতুন মানুষ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল 'হুর্-রে' বলে। লাফানোর ধকলে টেবিলটা নড়ে উঠল। রজনীগন্ধার স্তবক গোঁজা কাঁচের ফুলদানিটা ঠিকরে পড়ল মেঝেয়। ভেঙে খান খান।

ওরা সচেতন হয়ে উঠেছে। পরদার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কেউ শুনল কিনা, কেউ এসে পড়ল কিনা। দরজার দিক থেকে তুফানের চোখ ফিরছে না। সন্দেহ নিরসনের জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠি উঠি করছে ও। বাইরে বেরিয়ে দেখবে বোধ হয়।

আর একটুও অপেক্ষা করা উচিত নয়। ধরা পড়ে যাবে

মোতিয়ারী। দুটো করে ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে এসে হাজির হল। ঘরে ঢুকেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমোয়নি। ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে। খানিক পর ওপরে এলো রাজারাও। মোতিয়ারীর সামনে এসে দাঁড়াল একটু। তারপর দরজার ছিট-কিনিটা অতি সন্তর্পণে এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজে ভাবছে মোতিয়ারী—বেরোবে কিনা। না বেরোলে সন্দেহ জাগতে পারে, ফুলদানি ভাঙার আওয়াজ পেয়ে গিয়ে থাকবে হয়তো, তাদের তিনজকে দেখে মটকা মেরে পড়ে আছে। বেরোলে ভয়ের কিছু নেই—অন্তত আজকের দিনটায়। আজ শুধু ভালো করে দেখার পালা। নিয়ে যাবার পালা নয়। তাছাড়া মোতিয়ারী ঘরেও টিকতে পারছে না। বড্ড গুমোট। বুকের ভেতর আনচান করছে। রোজের মতো উঠে পড়ল। দরজা খুলে বেরোল। সিঁড়ি, সদর, পথ, মাঠ।

মাঠের মাঝখানে বসে আছে মোতিয়ারী। প্রতিদিনের মূর্তি। গালে হাত, আকাশে চোখ। আকাশটা এ রাতে আরো ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, আকাশ মাটি এক হয়ে যেতে পারে না কি কোনদিন। মাটির মানুষের আকাশচিন্তা আকাশে কোন বস্তুর বুকে রেখাপাত করে কি না কে জানে। কিন্তু আকাশের আলো মানুষের বুকে পৌঁছয় জীবন হয়ে।

যোগীনাথ মির্জাগালিবের কবিতা শোনাত মোতিয়ারীকে প্রায়ই। —কেঁও না ফিরদৌসসে দোজ্‌খকো মিলালে ইয়ারব। স্বর্গ আর নরককে এক করে কেন মিলিয়ে নেবে না বন্ধু! আকাশের আলোয় ঝরে পড়ুক স্বর্গের সুষমা। শান্তির পসরা নেমে আসুক মাটিতে। মাটির অন্ধকার নরক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। মাটি হয়ে উঠুক আকাশে মিশে আকাশের হৃদয়। মোতিয়ারী এর মানে বোঝেনি তখন। এখন বুঝছে! এখন বলতে আজ। এই মুহূর্তে।

নরক নরক—চতুর্দিকে নরক। নরক থেকে উদ্ধার হতে গিয়ে

আর এক নরককুণ্ডে মোতিয়ারী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখানেও নরকের আবর্জনা-স্তূপ জমে উঠেছে প্রচুর। কোথায় পালাবে এখান থেকে মোতিয়ারী—ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছে না। ওই আকাশে কি যেতে পারে না সে? আকাশের প্রতি তারায় তারায় যোগী-নাথের হাসিমুখ দেখছে মোতিয়ারী।

চমক ভাঙল রাজারাওয়ের ডাকে। —রাত অনেক হয়েছে। দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ। আর নয় ঘরে চল।

বাইরের চেয়ে ঘরে আসতেই লোকটার ওপর লক্ষ্য পড়েছে মোতিয়ারীর ভালো ক'রে। একটা দিগ্বিজয়ী-দিগ্বিজয়ী ভাব। খুশি চুঁইয়ে পড়ছে মুখ-চোখ দিয়ে। এসে যে চারপাইয়ে পড়ল—কুম্ভকর্ণ। এত ঘুম এত নাক ডাকা এত নিশ্চিন্ততা কিসে? মোতিয়ারী ভালো দামেই বিকবে। সেই আশ্বাস পেয়েছে নিশ্চয় সিংজীর কাছ থেকে।

চোখে-পাতায় এক করতে পারছে না মোতিয়ারী। ছটফট করছে বিছানার ওপর। উঠছে বসছে শুচ্ছে। আবার উঠছে....। কে যেন ডাকছে। ভেতর থেকে কে যেন বলছে, এই সুযোগ। এখুনি এই মুহূর্তে এ বাড়ি ছেড়ে এ ঘর ছেড়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যা! চলে যা! ....দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল মোতিয়ারী।....পথে। চলছে। চলার গতি বাড়ছে ক্রমে। কে যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে।

চোখের সামনে ভেসে উঠেছে শিওনীর সেই অশথতলা। যেখানে বসে বসে উপদেশ দিত যোগীনাথ সবাইকে। যেখানে যোগীনাথ খুন হয়েছে তারই জন্য! যেখানে রয়েছে যোগীনাথের সমাধি। সেখান-কার টানে সেই দিকে মোতিয়ারী চলেছে। রাস্তা, আবার রাস্তা।....

অশথতলায় এসে তাকাল চারধারে। কেউ কোথাও নেই, তেমন কেউ আসেনাও হয়তো। দু'চারটে শুকনো বুনো নীল ফুল পড়ে আছে মাটির সমাধি ঢিবির ওপর। কত এসেছে এখানে ছোটবেলা থেকে। আছড়ে পড়ল সমাধির ওপর। কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মনে হচ্ছে চোখের জলে যোগীনাথের নরম-নরম দু'পা ভিজছে বুঝি। ফোকলা মুখে হাসছে যোগীনাথ। মাথায় হাত বুলোচ্ছে। বুকের জ্বালা মাথার জ্বালা—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অশথতলার শান্তশীতল পরিবেশ থাকেনি বেশীক্ষণ। যদিও সকালের নরম রোদে তাপ ছিলনা তেমন, তবুও বাতাসটা খুব তাড়াতাড়ি উত্তাপে উত্তাপে ভরে উঠছিল যেন। আগুনের ঝাপটা লাগছে মোতিয়ারীর সর্বাঙ্গে। সম্বিৎ ফিরে পেল মোতিয়ারী। কে যেন আসছে। পায়ের শব্দ। যে এলো, একেবারে সামনে সে। মোতিয়ারী মুখ তুলল। শ্যামবতী। হাঁপাচ্ছে! গলার স্বর কাঁপছে, কথায় ঝাঁঝ। —মুখপুড়ী মরার কি কোন চুলো নেই তোর আর! কেন এলি? শীগগির চলে যা বলছি? নইলে যোগীনাথের মতন দশা হবে তোরও! কারো চোখে পড়লে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সবাই খাপ্পা।

কান্নাভেজা গলায় মোতিয়ারী প্রশ্ন করেছে, কেন সবাই খাপ্পা—অপরাধটা কি?

তুই সবার সঙ্গে ছলনা করেছিস, বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস! ঝুমনকে ছেড়ে শমরুকে ধরেছিস, শমরুকে ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিস। রাস্তায় আমার চোখে না পড়লে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হ'ত না আর। কেউ যদি আমায় এখানে দেখে, আমারও ধড়ে মাথাটা থাকবে না আর।

যাবার সময় মোতিয়ারীর হাত দুটো ধরে কেঁদে বলেছে শ্যামবতী, আমার কথা রাখ! জানিস তো আমার স্বামীটি কি রকম কাঠ-গোঁয়ার – বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য না জানি কি করে বসে! ওর কাছে তুই ডাইনী মেয়েছেলে। ঝুমনকে কাছে পেলে, গিলে খাওয়াও তোর পক্ষে অসম্ভব নয়!

একরকম দৌড়েই চলে গেছে শ্যামবতী। মোতিয়ারী যায়নি। সমাধির ওপর মাথা রেখে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। মনে মনে বলেছে,

যোগীনাথ, তুই তো সমস্ত জানিস! ঝুমনকে ছেড়েছি শমরুকে বাঁচানোর জন্য। আবার বাবা ঝুমন সইয়ের বর তুলারামের হাত থেকে শমরুকে বাঁচানোর জন্যই ওকেও ছাড়তে হয়েছে। যে যাই বলুক-তুই তো এসবের মধ্যে আমার কোন অপরাধ দেখিসনি কখনো। এটাই আমার জীবনে মস্ত পুরস্কার।

আবারো কার পায়ের শব্দ হচ্ছে যেন। হোক, কেউ সাবধান করতে এলে কারো কথায় নড়বেনা এক পা। বাঁচার জন্য পালিয়ে পালিয়ে মরে মরে বাঁচবেনা ময়না আর মোতিয়ারী।

সমাধির মাটি ফুঁড়ে, যোগীনাথের কথা বেরোচ্ছে যেন। বলেছিল যোগীনাথ বাবাকে। অনেকদিনের পুরনো কথা। কথাটা বলেছিল বাবার প্রশ্নের উত্তরে। মোতিয়ারী জ্ঞান ফিরে পাবার পর সই শ্যামবতীর বিয়ে দেখতে এসে তুলারামের তীর ছোঁড়া দেখছিল। শ্যামবতীর বগলের পাশ দিয়ে যাবে তীরটা। মনে হয়েছে তারই বগলের পাশ দিয়ে যাবে বুঝি। তীর ছুঁড়ল তুলারাম। মনে হল তার বুকের বাঁদিকটায় বিষ মাখানো ফলাটা সজোরে বিঁধে বসল। কি নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণা!

কেন এমন অনুভূতি হল?

ও নিজেই বুঝতে পারবে'খন একদিন।

বাবার প্রশ্ন আর যোগীনাথের উত্তর বারবার মোতিয়ারীর কানে বাজছে।

বাতাসের আগুন এবারে আর ঝাপটা মারছে না মোতি-য়ারীকে। গ্রাস করতে শুরু করেছে যেন। সারা দেহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মটাকে নিয়ে সমাধির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে বুঝি।

মাথা তুলল মোতিয়ারী। তুলারাম অশথগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ধনুক হাতে তাক করছে। তীরটা ছুঁড়বে ছুঁড়বে অবস্থা। আসার সময় তাহলে ওর চোখও এড়ায়নি মোতিয়ারী। ঠিক এসে হাজির হয়েছে।

কল্পনায় যেটা দেখেছিল মোতিয়ারী একদিন, চোখের সামনে সত্যি হতে চলেছে সেটা আজ। আজ বুঝতে পারছে, নিজের মৃত্যুকেই দেখেছিল অনেক আগে। তুলারাম সাক্ষাৎ মৃত্যু তার।

দুনিয়া দেখেছে মোতিয়ারী ভাল করে। যোগীনাথ ছাড়া কেউ তাকে চিনল না। জানল না কেউ তার অন্তর। ভুল বুঝেছে। ভুল ভেবেছে শুধু।

মৃত্যুর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। হোক সকলের শান্তি। শান্তি পাক মোতিয়ারীও। মাটির মেয়ে মিশে যাবে মাটিতে। মেশার পর ধুলো হয়ে ভাসবে বাতাসে। তারপর আকাশের হৃদয় হয়ে ঘুরে বেড়াবে শূন্যে। কত আনন্দ কত স্বস্তি।

মোতিয়ারী বসল সিধে হয়ে। বুকের কাছ থেকে হাত দু'খানা সরিয়ে নিল আস্তে আস্তে। তুলারামের সুবিধে হবে। তীরটা বেঁধাতে পারবে মোক্ষম জায়গায়।

অব্যর্থ লক্ষ্য তুলারামের। তীর এসে বিঁধল বুকের বাঁদিকে। বিষাক্ত ফলাটা হৃৎপিণ্ড ছেঁদা করে তাজা লাল রক্তে গাঢ় নীল মিশিয়ে দিল। যোগীনাথের সমাধি ঢিবির ওপর লুটিয়ে পড়ল মোতিয়ারী।

সমাধির নীল ফুল ক'টা উড়ে গেল একটা দমকা হাওয়ায়।

*　　　*　　　*

অশথতলায় যোগীনাথের সমাধি ঢিবির ওপর দেখলুম, বুনো নীলফুল পড়ে রয়েছে ক'টা।

কে দিয়ে যায় রোজ গোপনে, কেউ বলতে পারল না। কোনদিন কেউ দেখেনি কাউকে।

নিত্য নতুন ফুল। বাসি ফুল একটাও পড়ে নেই কোথাও। একটা দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে যায় হয়তো—মোতিয়ারীর শেষ নিশ্বাস পড়ার সময় গেছল যেমন।
